আমাদের অনাড়ম্বর

চেষ্টা

- দ্বিতীয় সংখ্যা -

জানুয়ারি ২০২১

প্রচেষ্টা

দ্বিতীয় বর্ষ,
প্রকাশকাল : জানুয়ারী - ২০২১

সম্পাদক

সৌমেন মণ্ডল

যুগ্ম সম্পাদক

মানবেন্দ্র পাত্র
উদয় শঙ্কর রক্ষিত

যোগাযোগের ঠিকানা

প্রচেষ্টা গ্রুপ
রাজপাড়া, এড়গোদা
ঝাড়গ্রাম - ৭২১৫০৫
পশ্চিমবঙ্গ

সামাজিক মাধ্যম

Facebook page : Prochesta Edu Tech
Youtube : Prochesta Group
Whatsapp : 9007422922
Website : www.prochestagroup.com

কথোপকথন

৯৯৩২৬২৯৯৮১, ৯৫৪৭০২২০৩৫

চিঠি পাঠাবেন

প্রচেষ্টা গ্রুপ
রাজপাড়া, এড়গোদা, ঝাড়গ্রাম
পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৫০৫

অক্ষরসজ্জা

বিশ্বজিৎ মেট্যা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

সঞ্জয় মজুমদার, ঝাড়গ্রাম

বইটি পাবেন

নন্দন ডিজিট্যাল জোন, এড়গোদা
রয়্যাল কম্পিউটার, মেদিনীপুর

বিনিময় - ৫০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

যাঁদের ত্যাগ ও আদর্শ এই ছোট পত্রিকা প্রকাশের একমাত্র ভিত্তি, যাঁদের দ্বারা আমরা প্রতি মুহূর্তে প্রাণিত হই — এই পত্রিকা তাঁদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম . . . ।

কিছু কথা

সাহিত্য আর জীবন একে অপরের পরিপূরক। সাহিত্য না থাকলে আমরা জীবনের কথা গুলোর অনুভূতির স্বাদ পেতাম না। যারা সাহিত্যচর্চা করেন তারা জীবনের নানাদিক উপলব্ধি করে ব্যক্ত করতে পারেন।

জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম জেলা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ। তার স্নিগ্ধ সবুজ রঙে দুচোখ মুগ্ধ হয়। অরণ্যের সবুজকে ঘিরে বয়ে চলেছে ডুলুং, সুবর্ণরেখা, তারাফেনী ও কংসাবতী। অজস্র প্রাচীন নিদর্শন স্মরণ করিয়ে দেয় প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস।

জঙ্গল মহলের শাল মহুয়ার সবুজ ছায়ায় ধামসা মাদলের তালে তালে পা মেলাতে ছুটে আসেন অজস্র মানুষ। নানা জাতি উপজাতির মানুষের বসবাস এখানে। তাই জীবনযাপন ও সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বিভূতিভূষণ, মহাশ্বেতা দেবী, ভবতোষ সতপথী থেকে নলিনী বেরা সকল সাহিত্যিকদের লেখাতেও উঠে এসেছে এখানকার মানুষের কাহিনী।

আদিবাসী সমাজের প্রাণপুরুষ সাধু রাম চাঁদ মুর্ম্মুর জন্মভূমি এই জেলা।

বর্তমানে ঝাড়গ্রাম জেলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান।

সন্ধ্যা নামলেই আদিবাসী গ্রাম থেকে ভেসে আসে ধামসা মাদলের ধিতাং ধিতাং বোল। শাল মহুয়া পিয়ালের বনে জ্যোৎস্নার আলো খেলা করে। এক অজানা আনন্দের অনুভূতির মাদকতায় মুগ্ধ হয় মন। ঝুমুর গানের সুরে আর মাদলের তালে হাতে হাত ধরে নাচে সবাই। এই অনাবিল আনন্দ আর কোথাও নেই।

থেমে নেই সাহিত্য চর্চাও। অজস্র কবি সাহিত্যিকদের কলম নিয়মিত জন্ম দেয় কত গল্প কবিতার। তাদের অনুভূতিরা ভাষা খুঁজে পায় নানা পত্র-পত্রিকায় অথবা নিজের কাব্যগ্রন্থে। এই সাহিত্য চর্চার গতিধারাকে অব্যাহত রাখতে আমাদের সকলের মিলিত প্রয়াস এই পত্রিকা।

ঝাড়গ্রামের সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার সাথে যারা যুক্ত ছিলেন এবং আছেন তাঁদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। নতুন প্রজন্মের যারা কলম ধরেছেন তাঁদেরও স্বাগত জানাই।

আসুন আমরা সবাই মিলে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির রথকে এগিয়ে নিয়ে চলি। পথ দেখাই পরবর্তী প্রজন্মকে। রক্ষা করি আমাদের এই সবুজে ঘেরা প্রকৃতি ও আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে। রচনা করি সাহিত্যের....

''প্রচেষ্টা'' গ্রুপের সম্পাদক শ্রীমান মুকুন্দ রাম চক্রবর্তীর দীর্ঘ দিনের পরিকল্পনা এবং অমিত, মানবেন্দ্র, উদয়, লালচাঁদ সহ সকল সদস্যদের ঐকান্তিক প্রয়াসের ফসল হল এই সাহিত্য পত্রিকা। ''গ্রন্থযাত্রা'', ''বস্ত্র বিতরণ'' কোভিড মোকাবিলায় অতিথি শ্রমিকদের খাবার প্রদান, এলাকায় বিভিন্ন সচেতনতার প্রচারসহ প্রায় পাঁচ হাজার মাস্ক বিতরণ ও দুঃস্থদের খাদ্যদ্রব্য বিতরণের মত নানারকম সমাজ সেবা মূলক কাজের পাশাপাশি এলাকার মানুষদের জীবনের কথা, সাহিত্য, সংস্কৃতি তুলে ধরার জন্য এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। তার ফলস্বরূপ গত বছর ২০২০ সালের মার্চ মাসে বেলপাহাড়ির ঢাঙিকুসুম গ্রামের শিশুদের শিক্ষা সামগ্রী প্রদান অনুষ্ঠানে ''প্রচেষ্টা'' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। তরুণ প্রজন্মের নতুন কবি ও সাহিত্যিকদের জন্য একটি মনোজ্ঞ পত্রিকা।

পাঠকদের মতামত এবং আগ্রহকে গুরুত্ব দিয়ে এই পত্রিকা আগামী দিনগুলিতে নিত্য নতুন ভাবনায় এবং আঙ্গিকে প্রকাশিত হবে। আশা রাখি আমাদের এই পত্রিকা স্থানীয় সাহিত্য এবং সংস্কৃতি চর্চার মাইলস্টোন হয়ে থাকবে।

আমাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও যদি পত্রিকাতে কোনও ভুল ত্রুটি থেকে যায় তার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

ধন্যবাদ সহ
— সৌমেন মণ্ডল

কথা প্রসঙ্গে

অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম যে কি লিখব ? যখনই লিখতে বসি তখনই শত সহস্র শোকার্ত মুহূর্তগুলি মাথার মধ্যে দৌড়-ঝাঁপ শুরু করে আমি ভাষা হারিয়ে ফেলি, অক্ষর হারাই, ... তা সত্ত্বেও লিখার চেষ্টাটা চালিয়ে গেলাম। কোভিড-১৯ এর তাণ্ডবে অভিশপ্ত দিনগুলো মনে করতেন না চাইলেও মনে পড়ে যায় সেই বাচ্চাটিকে, যে স্টেশনে মায়ের মৃতদেহ থেকে মাকে ফিরে পেতে চাইছিল। কল কারখানা বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে আমাদের ঘরের ছেলে মেয়েদের ঘটা করে নামকরণ করা হল ''পরিযায়ী শ্রমিক''। রেললাইন ধরে হেঁটে বাড়ি ফিরতে চাওয়া তরতাজা প্রাণের স্পন্দন মালগাড়ির ধাক্কায় থেমে যাওয়া, সাইকেলে ও খালি পায়ে হেঁটে হাজার হাজার মাইল পার হয়ে গ্রামে ফিরে বাড়ি ঢুকতে না পারার বেদনা কি খুব সহজেই ভোলা যায় ? অতিমারির হাত থেকে বাঁচতে যখন সবাই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টায় ব্যস্ত আর তখনই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় থেকে মনোরঞ্জন মাহাত -এর মতো অভিভাবক এসব সহ্য করতে না পেরে অভিমানে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন বহুদূরে না ফেরার দেশে। উনাদের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

তবে পৃথিবীর দ্বিমুখী বৈচিত্র্য সর্বত্রই দেখা যায়। এই অতিমারিতে শুধু হারায়নি, পেয়েছি বিশুদ্ধতা। দূষণের মাত্রা কমতে শুরু করেছিল, মানুষের হাতে অত্যাচারিত প্রকৃতি যেন নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল।

এত সকলের পরেও ''প্রচেষ্টা'' তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি, ''চরৈবেতি'' মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে চলেছে সমুখ পানে। যাঁদের চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সারাবছর ধরে নানাবিধ কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে মানুষের পাশে ও সাথে থাকার চেষ্টা করা গেছে তাঁদেরকে আমার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে প্রণাম, হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসা ও ধন্যবাদ জানাই।

বৃক্ষরোপণ, গ্রন্থযাত্রা (বই বিতরণ), বস্ত্র দান, করোনার মত অতিমারিতে এলাকার মানুষের সাথে ও পাশে থেকে মাস্ক ও ত্রাণ বিতরণের সাথে জঙ্গলমহলের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ''প্রচেষ্টা'' পত্রিকার মাধ্যমে ঘটাতে পেরে খুবই আনন্দিত। আর যাঁদের লেখনীতে ''প্রচেষ্টা'' পত্রিকা সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

''শিক্ষা আমাদের উদ্দেশ্য, সাফল্য আমাদের লক্ষ্য''— এই নিয়ে চলতে গেলেই প্রতিটি পদক্ষেপে প্রয়োজন আপনাদের আদেশ, উপদেশ, সাহায্য, সহযোগিতা, আশীর্বাদ ও সাথে থাকার আশ্বাস। তাহলেই আমার, আপনার, সবার – ''প্রচেষ্টা'' সার্থক হবে।

— নমস্কারান্তে
'প্রচেষ্টা'-র পক্ষে
মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী

যুগ্ম সহ সম্পাদকের কলমে

বহুদিন থেকেই ইচ্ছে হতো একটি পত্রিকা হোক। এই মফঃসল-এ আরো আরো সংস্কৃতি সম্পন্ন মেধাবী মনন গড়ে উঠুক। প্রাণ পাক নিজস্ব কথন, ভাষা। ছলকে উঠুক ডুলুং, তারাফেনী, সুবর্ণরেখা। শালপাতার দেশ ও লাল মাটির দেশ জুড়ে কত কত যে চুনি পান্না রয়েছে, আমরা জানিই না! আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সেইসব আলোকে একসাথে তুলে ধরার এক সামান্য প্রয়াস আমাদের এই পত্রিকা।

একবছর যাবৎ করোনা কাল ও দুঃসহ যাপনের মধ্যে চেষ্টা করেছি মাত্র— এই কিঞ্চিৎ জীবনকে প্রকৃত জীবনের কাছে সঁপে দিয়ে সৃষ্টির আলোয় আলোকিত করতে।

এই সংখ্যায় যারা আলো ছড়িয়েছেন, সমৃদ্ধ করেছেন এই পত্রিকার পক্ষ থেকে তাদের বিনম্র প্রণাম, শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানাই। 'প্রচেষ্টা' কর্মকাণ্ডে যাঁরা প্রতিদিন সামান্যতম হলেও আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের বিনীত প্রণাম।

— শ্রদ্ধাবনত
মানবেন্দ্র ও উদয়

শুভেচ্ছা বার্তা

ডুলুং নদীকে
কেন্দ্র করে আমার পরম আত্মীয় কবি
বন্ধুরা সৃজন উৎসবে মেতে উঠেছে। আমার মন তো উথালি পাথালি করেই।
অথচ নিরূপায় যেতে পারছি না।

'ডুলুঙ উঠে এসে কখন থিতু হয়ে বসেছে এখানে
গাব-ভেরেণ্ডার গাছে মউল মৌমাছি
গুনগুন করে তোমার গানেরইস্কুলে এইমাত্র ছুটির ঘণ্টা
বাজল
সারাক্ষণ আর কত বসে থাকা–
এইবার দরোজা খোল

খঞ্জনী বাজিয়ে মাধুকরী করে গেল
নুপূরবোষ্টুমী ডুলুঙের জলে চাঁদকুড়ি মাছ ধরেছে
আঁচল পেতে
কেউ কী কোথাও স্থলে জলে ডাক দিল–
নুপূর নুপূর
অমনি সে দাঁড়িয়েছে ঘুরে
ছবিটুকু স্পষ্ট মনে আছে

ও সুবর্ণরেখা, শুষ্ক ঠোঁটে কতদিন
চুম্বন আঁকোনি।

জেলা ''ডুলুং কবিতা উৎসবে''-র জন্য এবং এই উৎসবে প্রকাশিত
''প্রচেষ্টা'' পত্রিকার জন্য আমার প্রাণভরা শুভেচ্ছা রইল।
আবার
কোনো না কোনো দিন ''জঙ্গলমহল কথামৃত'' নিয়ে হাজির হব। ভালো
থেকো
সবাই।

— নলিনী বেরা

সূচিপত্র

কবিতা

দুঃখানন্দ মণ্ডল, উদয় শংকর রক্ষিত, চিত্ত মাহাত, সূর্যকান্ত মাহাতো, আলি উজ্জামান, স্মরণ রায়, রাজু রানা দাস, গৌতম নায়েক, সায়ন মিত্র, মুকুন্দ কর, অপূর্ব পাল, আত্রেয়ী মল্লিক, পুরন্দর ভৌমিক, শচীন প্রামানিক, অসীম মাহাত, রামকৃষ্ণ মহাপাত্র, মনতোষ মন্ডল, আতাউল গাওস, প্রবীর কুমার দত্ত, মানবেন্দ্র পাত্র, তপন কর্মকার, সৌমেন মণ্ডল, অলক জানা, চয়ন রায়, তপন ষড়ঙ্গী, ঋতশ্রী মান্না, বিপ্লব দত্ত, সোমা প্রধান, মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী, অসিত বরণ ষড়ঙ্গী, স্মিতা বাগ মণ্ডল, বেবী সাউ, স্বর্ণেন্দু সেনগুপ্ত, সুমিত পতি, বুদ্ধদেব মাহাত, রীতা আক্তার (বাংলাদেশ), সুদীপ্ত বিশাল, রাজা ভট্টাচার্য, সুব্রত দাস, অভিজিৎ দত্ত, দেবাশিস দন্ড, পতিতপাবন মাহাত, বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত, সুব্রত কর্মকার, প্রসাদ মল্লিক, মধুমিতা দত্ত সিংহ, শাশ্বতী হোসেন, প্রদীপ বটব্যাল, জয়দেব নন্দী, অজিত কুমার রাউৎ, রিম্পা ষড়ংগী, তমাল চক্রবর্তী, সমীর শীট, কমলিকা দত্ত, অনুরাধা কর্মকার, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সুনীত দত্ত, সোনাই ভট্টাচার্য্য

গল্প ও কথা

রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুব্রত মুখোপাধ্যায়, হরিশঙ্কর দে, প্রিয়ব্রত গোস্বামী, বিকাশ রায়, অমিত সিংহ, সুস্মিতা রায়চৌধুরী, শুভশ্রী সরকার, জয় সান্যাল, তপন সনগিরি, সুমন চ্যাটার্জি, মানবতা মাহাত, প্রদীপ মাহাত, জ্যোৎস্না সোরেন, অর্দ্ধেন্দু বিকাশ রানা, বিমল লামা

কবিতা

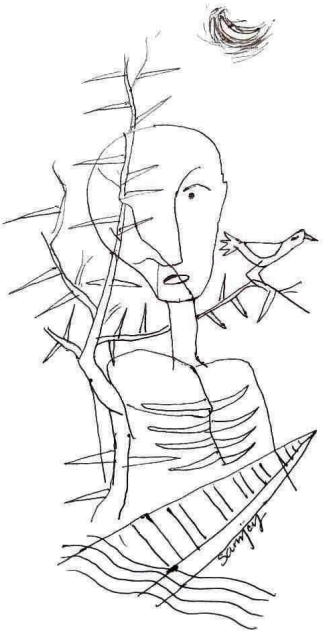

অ-পারদর্শী

উদয় শংকর রক্ষিত

... তারপর একটা অসুখ চরে গেলো
বুকের ভেতর; ঘোর অমানিশার মতো।

অস্ত্রশিক্ষায় তুমি এখন
বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছো।
তরবারিতে লেগে থাকা রক্ত মুছতে মুছতে
বললে—
''গুরুদক্ষিণাটা দিয়ে গেলাম গুরুদেব।''

ক্ষতে হাত দিতে বুঝলাম,
পারদর্শী হয়ে ওঠা হয়নি এখনও
তোমার অথবা আমার।

দাগ ৪০

দুঃখানন্দ মণ্ডল

অভিমানে বলেছিলে তুমি হাসতে কি পারো না!
উত্তরে একটি ছবি উপহার দিয়ে ছিলাম।

তারপর অনেকগুলি শরৎ কেটে গেছে
বিচ্ছিন্ন হয়েছে নদীর দুই কূল ভেঙেছে পাড়
ছিঁড়তে পারেনি শিকড় দাঁড়িয়ে আছে নির্বাক
বৃক্ষটি।

আরো অনেকদিন পর তুমি পাঠিয়েছিলে এক
চিলতে হাসি
তখনও নির্বাকে দাঁড়িয়ে আছে ভাঙা পাড়ের উপর
বৃক্ষটি।
তুমি বুঝে ছিলে তোমার চতুরতা ধরতে পারবো না
অনেক পুরানো দিনের হাসি উপহার দিলে!
আসলে বয়স বেড়েছে হাসির তারুণ্যতা ভিতরেই
থেকেছে
তুমিও ভুলেছো কেমন করে প্রাণ খুলে বাতাস
নিতে হয়।

গাছটি দাঁড়িয়ে আছে ঋতুচক্রের টানে আসে
পরিযায়ী
গভীর গহ্বরে কিসের অনুসন্ধানে এগিয়ে চলেছে
শিকড়
অবিরাম অন্তহীন গতিতে ছুটছে স্রোত
সময়কে ধরতে পারোনি, নদীর অন্য কূলে তুমি
একা
পাড় ভাঙছে গভীর গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে তোমার
মাটি।

কবিতা ও চাষবাস

চিত্ত মাহাত

কবিরা শব্দ নিয়ে মাঠময় ভরেছে কবিতা
কাগজে-কলমে শুধু লাঙল জোয়াল,
চাষিরা পুঁতেছে বীজ খুঁড়ে গভীরতা
অবিশ্রান্ত কুপিয়েছে মেহনতী হাতের কোদাল।
হালি হালি বীজতলা রুয়েছে কৃষাণী
স্বপ্নকে এনেছে আজ একান্ত বাস্তবে,
এভাবেই আমাদের চাষ হয় জানি
কবিতারা চিরকালই ফসলের স্বপ্ন দেখাবে।

সংস্কৃতি আজ মুঠোবন্দি

সূর্যকান্ত মাহাতো

সংস্কৃতি আজ মুঠোবন্দি
গল্প-কথা ? লজ্জায় মুখ লুকিয়ে কেবলই মলাটবন্দি

মাদলের ধিতাং তাল আর সুর তুলে না
ডিজের উচ্চকিত শব্দ টুঁটি চেপে ধরে
জঙ্গলমহলের সবুজে আজ হাওয়া খেলে না
ইঁট কাঠ বালির ইমারতে কেবল ধাক্কা মারে।

ঝুমুরের মতো সম্পদ ফোনে ঝাপ্টে মরে
শ্লীলতা হারিয়ে যায় অশ্লীলতার ওপারে।
সুস্থ সংস্কৃতি আজ ডুলুং নদীতে ভাসমান
সব ভুলে গাইছি কেবল অপসংস্কৃতির জয়গান।

আমার ঝাড়গ্রামের সবুজ বনানীর ছায়া
ঢেউ খেলানো হরিৎ ক্ষেতের মায়া
পাতা নাচ ঝুমুর নাচের গর্ব মেখে গায়ে
আঁচল মেলেছে লোকসংস্কৃতির পায়ে।

সেসব কেমন বালিতে আজ মুখ গুঁজে
হাঁ মুখে গ্রাস করেছে মুঠো ফোন সেজে।
তবুও ঐতিহ্য তো চিরকালই বটগাছ
প্রত্যাশা ফিরে আসবেই হৃত সেইসব নাচ।

নবুয়াত

আলি উজ্জামান

কোথায় যেতে চাও পলাতকা ?
আজও তেমন অর্থে অর্থবান নয়
যুবতীর তলপেটে লিঙ্গত্বকের সরে আসা।

তাই, জলের ভেতর মেঘজন্মের জাগতিক সফলতায়,
ধুলো পিছলে চলে গেলো তোমাদের চৌকাঠে।

এখন, কিছু বাতাসে ভাসিয়ে রাখা ভালো,
না জানি কখন তোমারও কানে জিব্রাইল এসে বলে যায়,
পড়ো, পড়ো। দূরে আকাশের বিদ্যুৎ চমকে মস্ত পাহাড়,
সুরমা হয়ে এলো, তোমার চোখে, চোখের জলে।

প্রকৃতির রূপে

স্মরণ রায়

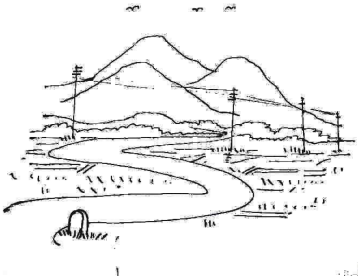

সকাল সাড়ে এগারো, ঝিরঝিরে একপশলা বৃষ্টির অবসানে
মেঘমুক্ত নীল আকাশ, নির্মল সমীরণে, প্রকৃতির অকৃপণ রূপে
আমি একলা বসে, নিশ্চুপ নির্জন ছোট একটা ঘরে
তিনদিক ঘেরা দেওয়াল, সামনের দিকটা খোলা
পিছনের দেয়ালে একটা চেয়ার নিয়ে আমি বসে
হঠাৎ চোখ গেল নীল আকাশের দিকে, দৃশ্যটা এমন —
সামনের বাড়ির ছাদ ও আমার ঘরের কার্ণিশের মাঝে
একফালি নীল আকাশ দৃশ্যমান, যেন একটা নদী।
আনমনে কিছুক্ষণ কাটল, কিভাবে ও কিভেবে জানিনা,
হঠাৎ বাঁ দেওয়ালের কোন ঘেসে দেখা দিলো একখণ্ড মেঘ
সাদা পেঁজা মেঘ, নীল আকাশ, ভারী সুন্দর একটা দৃশ্য
ভারী সুন্দর একটা অনুভূতি মনোরম প্রকৃতি মন ভরিয়ে তুললো
একমনে, একপ্রাণে এই সৌন্দর্যের স্বাদ নিতে লাগলাম
হঠাৎ খেয়াল হলো, — সাদা ভেলা রূপী মেঘ নীল নদীর বুক বেয়ে
অতি ধীরে সন্তর্পণে ভেসে চলেছে তার গন্তব্যে,
এইভাবে কখন যেন পৌঁছে গেলো ডান দেওয়ালের কোণে।
অনুভূতির স্বাদ বদল হলো, বুকের মধ্যে একটা ব্যথা
পাঁজর ভাঙা, দমবন্ধ একটা ব্যথা হৃদয়কে উথাল পাথাল করলো
তারপর ভেলারূপী মেঘটা একসময় দৃষ্টির বাইরে চলে গেল
পড়ে রইল নিশ্চল নিশ্চুপ নির্জন নীল নদীরূপী আকাশ
আমার ঘোর কাটলো, ভাবতে লাগলাম —
এমন কেন হলো ? কেন এমন হয়!

সময়

রাজু রানা দাস

একদিন একটি ছোট্ট পাখি আমায় ডেকে বললো
সময় এখন অনেক পেরিয়ে গেছে,
চেয়ে দেখ।

এখানে সেখানে আঁকি-বুকি-ভাঙন
হিসেব করলে আরও হিসেব পাবে।
ঐ দেখ শুনতে পাচ্ছো,
সময়ের মেল ট্রেন জংশন ছুঁয়ে চলে গেল
তাকে ফিরে তাকাতেই হবে।
নইলে যৌবন নদীর ছলাৎ-ছল জলে
নৌকা পানসির ছন্দ বিহারে
মনের ঘরে ছট্-পটানি কেন ?

একটা প্রবল স্রোতে ভাসতে
নতুন পথে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে হয় কেন ?
একটা নদীর কাছে আত্ম সমর্পণে তেতে উঠি।

হঠাৎ চোখ মেলতে দেখি
মশারির জালে টিকটিকি লেজ নেড়ে বলছে
সময়ের বয়স হলেও, যৌবনের দামামা বাজাও।

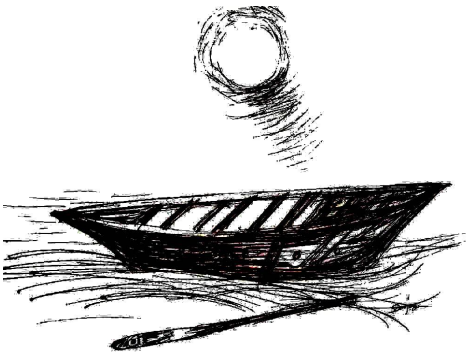

অর্থ-অনর্থ

গৌতম নায়েক

অর্থের পেছনে ছুটতে থাকা মানুষটা
একটা সময় জীবনের অর্থই হারিয়ে
ফেলে।
হারিয়ে ফেলে তার সামাজিক সত্তা,
মানবিক মূল্যবোধ।
পৃথিবীর নির্যাসটুকু নিংড়ে নিয়ে
সে একাই মেতে উঠতে চায় ভোগ উৎসবে,
এতে কি হয় তার প্রকৃত সুখবোধ
নাকি এটা সামাজিক প্রতিশোধ ?
অর্থের মোহে মানুষটা ভুলে যায় কেন এই
পৃথিবীতে আসা ?
নিসর্গ প্রকৃতির বুকে কেন এত
ভালোবাসা ?
সে ভুলে যায় কেন হৃদয়ে দোলা দেয়
সুনীল পবন ?
'আমি ও আমার' এই শব্দবন্ধ টুকুতেই
কেন সীমায়িত হয় জীবন ?
অর্থের স্তুপে কখনো বা অট্টালিকা পরে,
সে কেবলই সুখ হাতড়ে ফেরে।
ক্রমশ বয়সের ভারে নুইয়ে পড়ে দেহ
মনে বাসা বাঁধে কঠিন অসুখ,
হৃদয়ের এককোণে অবহেলায় অনাদরে
পড়ে থাকে সুখ।

পাহাড়ী অভিলাষ

সায়ন মিত্র

লাল পাহাড়ীর মেয়ে-
আমায় কী দেবে উপহার ?
বিদায় বেলায়।
তুমি বরং আমায় একটা গ্রাম দিও,
কিছু লাল, নীল, সাদা নাম না জানা ফুল,
আর এক দলা লাল মাটি অথবা একটা লাল পাথর।
আমিও দেব তোমায় –
একটা গোটা শহর,
নিয়ন আলোয় সাজানো অনেকখানি অন্ধকার,
জমকালো হাইরাইজে মুখ ঢাকা চাঁদের উলঙ্গ প্রতিকৃতি,
দামী রেসতরাঁয় কমদামী কয়েকটা রাত্রি।
তার বদলে তুমি আমায়–
কয়েকটা লন্ঠনের আলো দিও,
ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক দিও,
পাহাড়ী সন্ধ্যা দিও,
শাল, সেগুন আর ঝুমকো জবায় ঘেরা একটা চাঁদ দিও।
রাঙ্গামাটির মেয়ে -
আমার কালচে ধূসর শহরটা বরং তুমি নিও,
আর,
তোমার রাঙ্গা মাটির দেশ,
আমায় বিদায় বেলায় দিও উপহার।।

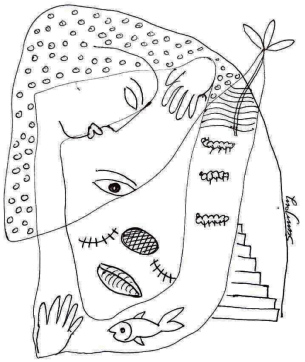

সভ্যতার নিয়মে

মুকুন্দ কর

নির্জন রাস্তা, প্রখর রৌদ্র,
উড়ন্ত কাকের ছায়া অদৃশ্য,
গলির বাঁক; আবর্জনা
ভুক্তাবশেষ সংলগ্ন ডাস্টবিনের
এঁটোপাতা পায় নাড়ির স্পন্দন।
তারপর শব্দহীন, নিস্তব্ধ।
রক্তের স্রোত খানিকটা তলদেশ ছাপিয়ে
মিশে যায় নর্দমার শ্যাওলায়।
লোকলজ্জায় বিবেকের মৃত্যু।

সভ্যতার নিয়মে বাঁশির শব্দ
পিষ্ট হয় ঢাকের আওয়াজ।
ছকে বাঁধা নিয়মে
সৃষ্ট প্রাণ, বৈধ সন্তান।
উপরে ফ্যান, পাশে খোলা কালো কাঁচ
প্রাণ ধারণের উপযুক্ত স্থান।

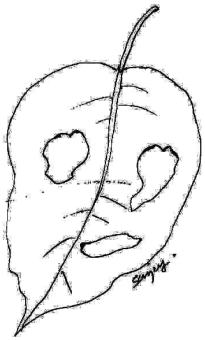

নিবেদন আছে

অপূর্ব পাল

নিবেদন আছে,
কিছু কাল ছুটি নেবো
নদী পারে যেতে হবে আরও একবার
ধানের চারা হবো,
লক্ষ্মীগোলার ধান সুজলা আঁচলে;
দেহ মনে কালি মেখেছি কত
শত ক্লেদ কলুষ চিত্তময়
এ দেহে তোমাকে ছোঁয়ার নয়;
ডুব দেবো কলিদহে
মৃত্যু নামে বিশুদ্ধির জলে।

এ দেহ ভাসিয়ে দিও
ভেলা বেঁধে রেখোনা আর অমরার ঘাটে
শুদ্ধ চরাচরে ফিরে ধানের চারা হবো,
ধানক্ষেত বেহুলা আঁচলে।

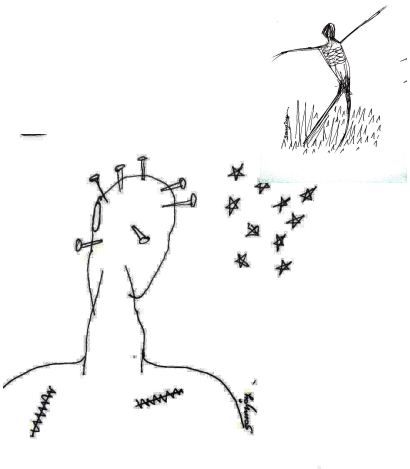

শিশু শ্রম

আত্রেয়ী মল্লিক

দারিদ্রতার সমুদ্রে অথৈ জলে ভেসে,
ছোট্ট শিশু বাধ্য হয়ে রাস্তায় দাঁড়ায় শেষে।

রান্না বাটি, কান্নাকাটি, শিশু মনের ছুটি,
মাস ফুরোলে পয়সা পাবে, দিন ফুরোলে ভাত-রুটি।

উল্টো চটি পরার বয়সে, ছিঁড়ছে চুলের মুঠি,
ছোট্ট হাতে, তাল মেলাতে, হলে ভুল ত্রুটি।

বয়স অল্প, কাঁধ ছোটো, দায়িত্ব বেজায় বড়,
মালিক বাবুর, কোঁচকানো ভ্রূতে, নিতান্ত জড়সড়।

স্বপ্ন ভঙ্গের দিন ফুরোলে, ব্যাথার রাত আসে,
বাচ্চা ছেলে, শৈশব ভুলে, উন্নীত জীবন্ত লাশে।

অভাব অনটন থাক যতই, শিশু শ্রম বন্ধ হোক,
অন্ধকার রাতের শেষে, ওরা দেখুক নতুন আলোক।।

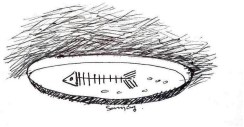

ভাইরাসের চাইতে ভয়ঙ্কর ক্ষুধা
শচীন প্রামানিক

দশ হাত কাপড়টা যেন দিন দিন কমছে
ঢেলকি মুর্মুর জীবনের মতোই
পোড়ামুখী ভাতারটাকে খেয়েছে গত বছর
যৌবনে ঘুণ ধরেছে বুকের দুধ শুকিয়েছে
ঘ্যান ঘ্যান করছে খাবার জন্য ছেলেটা
একুশ দিন ধরে করোনার লকডাউনে
নদীর বালি তোলা বন্ধ, রোজগারও বন্ধ
এদিকে ফাল্গুন মাসের শারুল পূজা হয়ে যায়
অজান্তে।

শালের ডাল শুকনো চোখ তার চাতকি
পাশ দিয়ে কাঁসাই তাকে দেখে খিল খিল করে
হেঁসে বইয়ে যাচ্ছে
মাঝে মাঝে রাগ হয় তার নদীটার উপর
সতীন ভেবে গালও দেয়
সেদিন পড়ন্ত বিকেলে সতীনের কোলে স্নান
করে শয্যা নিলো ঢেলকি
জ্বরে গা ইঁটের মতো পুড়ে শক্ত হচ্ছে
তার চোখের জলও খাবার চাইছে।

সন্ধের সময় এম্বুলেন্স এসে তাকে সোজা নিয়ে
গেলো বেলেঘাটা আই ডি
পরের দিন দরদী সমাজ বিদায় দিলো তাকে
কোভিড ১৯ পজিটিভ ছাপ্পা দিয়ে।

সৃজন
পুরন্দর ভৌমিক

বৃহন্নলারা আগুন হোক আজ
যুধিষ্ঠির অহংকারে মত্ত পাশাখেলায়;
পুঁথিবিচারের মল মাসে তাই
অঝোর শ্রাবণধারা,
সৃষ্টির পৃথিবী না হয় সৃজিত হোক
নতুনভাবে গোবি-সাহারা —
ধ্বংসের কিনারায়!
ধ্বংস মানেই তো - ধ্বংস তুমি-আমি
ধ্বংস কোনো জীর্ণতা অদৃশ্য ইশারায়!

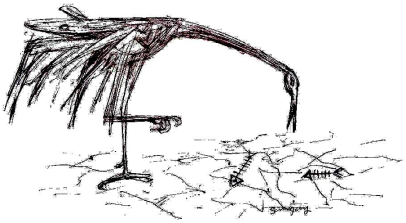

কাকে বইলব দুখের কথা

অসীম মাহাত

দ্যাখ বাবু তরাও হামকে পেঁওদা ভাবিস না,
হামার মায় বাপে নাম রাইখেছিল ডমন মাহাত, গেরাম আর পোস্টাপিস একঠিনেই বঠে দিয়াশী আর থানাটা পইড়ছে বেলপাহাড়ী।
ইয়ার উয়ার ঘরে মুনিষ খাইট্যে হামার কনঅ রকমে টাইনে টুইনে সংসারটা চলেএ,
বও বিটিকে নিয়েঁ মাথা গুঁইজে থাকার মতন আছেএ একটা চঁটি পাইখের লেখেন ঘর,
তবহে বাবু ভদরভং।
কি বইলব, আর কাকে বইলব বাবু দুখের কথা,
সরকারি খাতায় নাকি হামরা হলি বড়অ লক!
ঐ ত উপর পাড়হার চেপা ডাক্তার, মাঝ পাড়হার বুচা উকিল
অরা সওব সরকারের খাতায় গরিব লক!
অদের ঘরে কিসের অভাব ?
ভাথ-তরকারি রাঁধার জন্যেএ লক, তিন চাইরটা মটর গাড়ি, দুটা কইরে ভুখেল ভুখেল পাকা ঘর,
সকইল লক চাকরি করহে, সে রমরমইয়া ব্যাপার,
তাও অরা সরকারি দু-দুটা ঘর পাইলঅ।
হামি পচু মাষ্টারকে পিটিশান লিখা করায় করায়, জাঁয়েঁ জাঁয়েঁ, দিঁয়েঁ দিঁয়েঁ থইকে গেছি।
গাঁয়ের লেতাদের কাছেএ, পনচায়েত অফিসে, বলক অফিসে গ্যালি, জাঁয়েঁ বাবু গিলাকে জড় হাথ কইরে বললি-বাবু হামি মুরখ-সুরখ লক
হামার সাত কুলে কেও নায়ঁ,
হামার জমি জায়গা নায়ঁ, দিন আনি দিন খাই, কনহ্ রকমে পেট চলহে, গাইজে গরিব লক বঠি বাবু, হামার একটা ঘরের ব্যবস্থা কইরে দাও ন।
বও ছানাকে নিয়েঁ জাড়ের দিনেএ থাইকতে দমে কষ্ট, জলের দিনেএ আরঅ বেশি।
সওব বাবু গিলায় যে যার মতন পেঁদ দেখায়ঁ হামকে বুড়হা আঙুল দেখাইলঅ, কেউ মুহে রা কাইড়লহ, কেও কাইড়লহ নাই,
শালা সওব শিহালের একেই ডাক।
জানই ত বাবু গরিবের জন্যে কারহও মাথা ফাটে নাই,
কতঅ বছরলে যে যাছি আর আসছি তার ঠিক ঠিকানা নাই।
জন বাবুর কাছ যাই
সওব বাবুয়েই বলহে তকে উপরে যাতে হবেক।
বলি বাবু, আর হামরাকে কতঅ উপরে পাঠালে তাদের শান্তি হবেক ?
চুষবি ত একবাইরা জঁকের মত চুষ ন,
কাটা ঘায়ে টুকু টুকু নুন ছিটকায়ঁ ক্যানেএ এতঅ ছটপটা করাছিস।

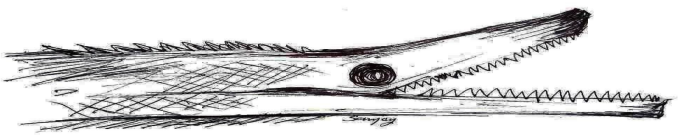

টিলার আড়ালে, কৃষ্ণচূড়ায়

মনতোষ মন্ডল

বসন্ত বাতাস, শাল-পিয়ালের বন
টিলার আড়ালে সাজানো বাগান।

বকুলমণি আর হাসে না...!
স্বামী তার কৃষ্ণচূড়ায় অদৃশ্য।
তবুও ভালোবাসা আঁকে...!

চাকরিটা অযাচিত
মনের যন্ত্রণায় দগ্ধ...!

সত্যের শয়তানি আজও কুরে কুরে
জীবন অতিষ্ঠ, একলা বিছানায়...!

টিলার আড়ালে কৃষ্ণচূড়ার তলায়
বকুলমণি আজও খুঁজে চলে সেই প্রেম...
নগ্নতায় নয়, পূর্ণতায় বাঁধা।

শেষ সব...
রক্তমাংসের চামড়াতে যে সভ্যতা
তা বকুলমণির চেতনায় ফোটেনি।
তবুও শূন্য মনে কাজের অগোচরে
স্বামীর ভালোবাসা খুঁজে ফেরে চলে
টিলার আড়ালে কৃষ্ণচূড়ায়...!

না! আসে না।
টিলা ভেঙে খুঁজে ফেরে...
তবুও না...!

চোখের জল কালো শয্যায়
বারুদের গন্ধে, স...ব বিলীন...!!

খোঁজ

রামকৃষ্ণ মহাপাত্র

শান্ত হোক এই সময়, হৃদয়ে
গভীর এই আলোর স্পর্শ কী আনন্দে
আজ ধ্বনিময় হল!
মগ্ন পাখির স্বরে,
অনশ্বর ডানায় মায়াবী মাটির ঘোর
জেগে আছে নিবিড়তা নিয়ে।
সুদূরে, নিভৃতে কোনো
উদাসীন মেঘ ফেরে আজও
একা একা

গহন পাতার খোঁজে...

ছাপ

আতাউল গাওস

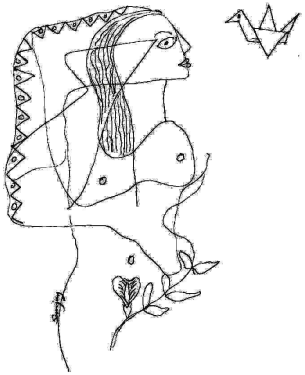

পৃথিবীর জীবন কাঁটাতারে মোড়া
কালো চাঁদ থেকে শূন্যে ঝুলছে অগুনতি মাস্ক
পথ চলে না তবু বলি পথ চলে যায় ...
সে পথের বাঁকে বাঁকে অপেক্ষারত মৃত্যু আমি বলি
দাও এক আঁচল রক্তমাখা পায়ের ছাপ
ধুলো জানে আরও হাজার হাজার চিহ্নহীন পথচলা
অনন্ত যাত্রা এ ... ফুল ফোটার মতো
কখন ঘুমিয়ে পড়েন ভগবান কেউ টের পায় না
শুধু জানে মা
দিক্ দিগন্তের অসীম শূন্যতায় পড়ে থাকে বেওয়ারিশ লাগেজ
এক
মাটি শুষে নেয় ক্লান্ত জননীর কপালের ঘাম চোখের জল
শিশুর পেটের অবলা খিদে।

আমি দেখছি কালো চাঁদ থেকে শূন্যে ঝুলছে
অগুনতি গাঢ় নীল মাস্ক্
আর পৃথিবী বেপরোয়া।

ইতিকথা

প্রবীর কুমার দত্ত

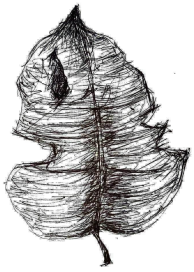

এসো ভাব করি মনে মনে,
বিনিময় করি হাজার বছরের প্রতিশ্রুতির কথা,
লিখে রাখি বিশ্বাসের খাতায়,
কবে ডুবেছিল সূর্য কোন আঁধারের গভীরতায়,
কোন পরিখায় আঁকা ছিল বিচিত্র চিত্ররেখা,
মানবিক পরিত্রাণের পথে উন্নত সভ্যতা ?
লেখা ছিল প্রতিটি গুহার গায়ে সে এক নতুন সকাল,
চিরায়ত স্বপ্নের ভোর হওয়া প্রতিদিনের নব্যতায়,
একবুক সাফল্যের চোখে চক্‌চকে শপথের আলোয় ভাসা হাসিমুখ,
রোজকার দুনিয়ার বেলা অবেলায়।
এসো পথ আঁকি মোমের পুতুলের মহিমায়,
তুমি আমি দু'জনায় মিলে নতুন করে প্রেমের ঘর গড়ি স্বমহিমায়,
বিরাজ করুক সাগরের বুকে এক অমৃতময় স্বর্গের সৌরভ,
বিদায় নিক এ পৃথিবীর বুক হতে
বেদনার বালুচরের যাবতীয় ইতিকথা।

ভাসান

মানবেন্দ্র পাত্র

জলের আকাঙ্ক্ষায় ভেসে যেও।

ভেসে যাও নৌকো ও নাবিক

সংকল্প রেখায় ভরা নদ-নদী;
ভাসমান আবহ-বিন্যাস —

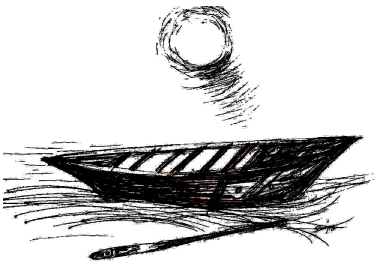

গুলে গুলে যে জীবন পাওয়া যায়
কাঠামো খুলে গেলেও আর তার অবয়ব নেই
সহজেই ভোলা যায় হাতের তালু-ও

এই যে এত কক্ষপথ, এত তার অক্ষসময়
তবু তো চরম একক আসে, ঘন হয়ে আসে আলো
ডানা মেলে দেয় উজ্জ্বয়ন
বিস্তারের পর্যায় ঘোর ... জলেই নামি।
ডুবে যাই, চোখ রেখে বসে থাকি
চেয়ে নিই জল

ভেসে যায় দাহ ও জনন

যে কবিতা লেখা যায় নি

তপন কর্মকার

শুধু আহতের সংখ্যা, তাও নির্ভুল গোনা নয়।
কিছু রক্তাক্ত কিছু মৃত
ছোট্ট খুপরি, ওদের ভাস্কর্য সাজানো
একলা হলেই ভালো অপেক্ষাকৃত

কে কবে কোথায় চেয়েছে
কলম বদল অথবা একান্ত অনুধাবন ?
শতাব্দীর সাথে শুধু আসে আর যায়
শ'য়ে শ'য়ে সেই একই শ্রাবণ।

শরৎ সমগ্র অথবা জানালার ওপারে আকাশ জানে
ঘাম ভেজা কলমের ব্যর্থতা,
একঘরে হয় শব্দেরা, সে কবিতা লেখা যায় নি
ভালো আছি বলে চিৎকার, কেই বা জানে অর্থ তা।

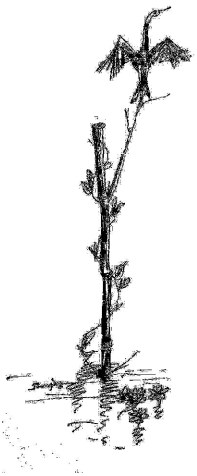

কিছু রন্ধ্রে থাক, সবই কি যাবে বিলানো।
তাক ভর্ত্তি বছর সাজাই সাক্ষী প্রয়োজনে,
গোপন গর্ভ, প্রসব হলো না সে কবিতা
কি হবে আর বৃথা আয়োজনে।

উপলব্ধি

সৌমেন মণ্ডল

আকাশের রঙে মিশে গেছে মনের খবর
সন্ধ্যে নামলেই কতো কাছের মানুষ আকাশের তারা হয়ে মিট মিট করে হাসে

হিমেল বাতাস বাইরে থাকতে দেয় না আর
ঢুকে পড়ি আমার ছোট্ট গন্ডীর ভেতর
একেবারে একলা থাকা। আমার সাথে বাস করে কতো স্মৃতি। তাদের ভীড়ে খুঁজে পাই কতো মুহূর্তদের।

মন - সে তো একলাই থাকে চিরকাল।
মাঝে মাঝে কেউ এসে একটু খুশীর পরশ দিয়ে যায়।

সে পরশ তো ক্ষণিকের...

রাত গভীর হলে ভীড় করে কতো স্বপ্ন
তারার মতোই নিভে আর জ্বলে যায়।
তবুও স্বপ্ন দেখা চাই।

ভালো লাগা ভালো বাসা ভালো থাকা - এই তিন নিয়ে যারা থাকে, তারাই প্রকৃত সুখী এ পৃথিবীতে।
বাকি মিথ্যে সব, অলীক সুখ।

সতীপীঠ

অলক জানা

প্রিয় দহনেই অপার আনন্দপুর
নীরবে নির্ভয়ে হাঁটুগেড়ে বসে থাকি
প্রতিজ্ঞায়, যদি স্ববেগে আসো, ছলনা
ছাড়াই, জরুরি বিশ্বাসে, মহাকাব্যের
গান-বাতাসের কানাকানি বৃষ্টি বাক্যে
ঝরে। সব কিছুইতো জেনে বসে আছো
ভালোমন্দ সুখ অসুখের নানাবিধ
জ্যামিতি, তবে কী তুমি পাথর চরিৎ ?

সব দাঙ্গা হয়তো একদা যাবে থেমে
বরাদ্দ শস্য, মাটির অধিকার পাবে
সমস্ত কারিগর, উল্লাস ভাবাবেগে
ভাসবে, পৃথিবীর সবকিছু আকারে
সতীপীঠ, সাহসে সোহাগে আমি হেঁটে
যেতে চাই হাতে হাতে অনন্তের দিকে।

দম্ভচূর্ণ

তপন ষড়ঙ্গী

আজ আমি ক্ষমতাশালী —
দেখাই ক্ষমতার আস্ফালন;
সে খুব বিত্তশালী —
করে খালি বিনোদন।
তিনি নন সহজসরল —
ছড়ান মিথ্যার ফুলঝুরি;
গায়ে গতরে বহুবল —
দেখান কেবল বাহাদুরি;
হ'ল এক দুর্ঘটনা —
ক্ষমতা হ'ল চুরমার;
এল এক যাতনা —
সব অর্থ ছারখার।
সত্যের হ'ল উদ্ঘাটন —
থাকল না তো সম্মান;
আরো বড় বলবান —
করল যে তার পতন।
তাই তো বলি শ্রেষ্ঠ মানুষ —
প্রকৃতির এই দাস;
থাকুক মান আর হুঁশ —
নয়তো জেনো সর্বনাশ।
প্রকৃতির যদি করি সেবা —
ধন্য মানব জাতি;
মানুষের জন্য মনে ভাবা —
নয়তো জেনো বিপত্তি।

সন্তান

চয়ন রায়

একটার পর একটা ঢিল ছুড়ছে জলে
হাসছে মাথা নাড়াচ্ছে
হাসছে মাথা ঝাকাচ্ছে
বিস্ময়ে বলে চলেছে কত কতকিছু

উদ্যানের প্রতিবিম্ব দিঘির জলে
তছ্‌নছ্‌ তছ্‌নছ্‌ হয়ে যাচ্‌ছে

স্তব্ধ অভ্যন্তর কেমন এলোমেলো করে দেয়
বুকের গভীরে যত্নে লালিত
ঘোমটা টানা স্নেহময়ী মাতা
হারিয়ে যায় বর্ণ রেখার বিন্যাসে
কত কত কথা, কত কত কথা

এছাড়া কি কিছুই আঁকতে পারো না
গাছপালা আকাশ নদী পথ প্রান্তরের ছবি

না পারি না। পারলেও হয় না

হাসছে মাথা নাড়াচ্ছে
হাসছে মাথা ঝাকাচ্ছে
অসীম গুম মেরে গেলো
ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে
স্বাভাবিকত্ব হারাচ্‌ছে
চুনখসা দেওয়ালে চোখ আটকে গেলো
অনেক সময় পার হবে বলে

হারিয়ে যাচ্ছে হারিয়ে যাবে
ফিরে এসো, ফিরে এসো মাতার সন্তান

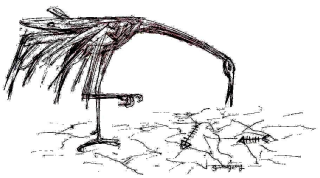

অভিলাষ

ঋতশ্রী মান্না

লালধুলো উড়ে যায় বিরহবাতাসে
পলাশের মোহ তবু ফিরে ফিরে আসে

অন্ধকারে বয়ে যায় মৃদুভাষী আলো
গল্পটিও এইমাত্র রাস্তা হারালো

শরীরে আগুন রাখা পলাশের বন
মুখোমুখি খোওয়া গেছি আমরা দু'জন

আগুনের ধার ঘেঁষে খসে যাক ছাই
এসো, আজ এ স্বপ্নে আগুন পোহাই

ঝরাপাতা, জমা ঝড়, যত খড়কুটো
স্বপ্ন জমিয়ে রাখে পলাশের মুঠো

পলাশের ডাল ছুঁয়ে নিভে এলে রোদ
আগুন পেরিয়ে যাক অযথা বিরোধ

অভিমান ফুটে থাক নিচু অভিলাষে
যেভাবে হৃদয় ফোটে একান্ত পলাশে।

আবেদন

বিপ্লব দত্ত

নিরাপদ নয় আপদের স্বর,
নিছক ছদ্মবেশীদের 'পর বৃথা নির্ভর।
দেহলোলুপ নেকড়ের অপচিকীর্ষা,
নিরাপত্তাহীনতার চরম ভাষা।
আদিম প্রবৃত্তিসাধনের তীব্র ইচ্ছে,
অসভ্যতার গোগ্রাস নিয়ত সভ্যতাকে গিলছে
বর্বরতার সদর্পে অস্তিত্ব ঘোষণা,
চক্ষুলজ্জাহীন কর্কটরোগে মানবিকতার যন্ত্রণা।
আক্রান্ত জন্মদাত্রীকূলের নিদারুণ পরিণাম,
পৌরুষত্ব আজ সম্মানকে দিয়ে যায় ভারী দাম।
অগ্রগতির ক্রোমোজমদের দৌরাত্ম্য,
পাপী হও প্রভু তবু তারা যেন হয় সব মৃত।
প্রতিটি নারীর জননী সত্তা তার সৌভাগ্য,
তবু অনিচ্ছার বুকে সেই বীজটির অঙ্কুর অযোগ্য।
জননের পরিণাম হোক না একটি প্রাণ,
হই না সবাই মাতৃযোনীর দান;
তার ক্ষমতাকে করো সম্মান-
ভুলবার নয়..
মানবিকতা সেই জননীরই দান।

ইচ্ছে কথা
সোমা প্রধান

ঘুমের ঘোরে পথ হেঁটেছি দরজা খোলা
আগল টেনে বুকের খাঁচায় নিচ্ছ পুরে
আমারও ছিলো মুখোমুখি ইচ্ছে কথার
পথের সময় বেয়াক্কেলে যাচ্ছে ঘুরে।

সুযোগ পেলে তোমার হাতের কলম হবো
আঙুল ছুঁয়ে ঠোঁটের আঁচড় খাতার বুকে
অজানা সব গল্প শোনায় রাতের আকাশ
মনকেমনের নতুন আলো তোমার মুখে।

একদিন ঠিক হারিয়ে যাবো মিছিল ভিড়ে
জানান দেবে স্বপ্ন আমার মাইলস্টোনে
কলেজ স্ট্রিটে গ্রন্থকীট আর বইয়ের মলাট
ব্যস্ত কবি উপন্যাসের ফাইল গোনে।

আজকে হঠাৎ সকাল হয়ে দরজা খোলো
মেঘলা রোদে ছিটকে পড়ে সোনার তরী
শিমুল শিমুল পায়ের ছাপে আল্পনা দিই
সেঁকছে পিঠ মিইয়ে আসা আদর বড়ি।

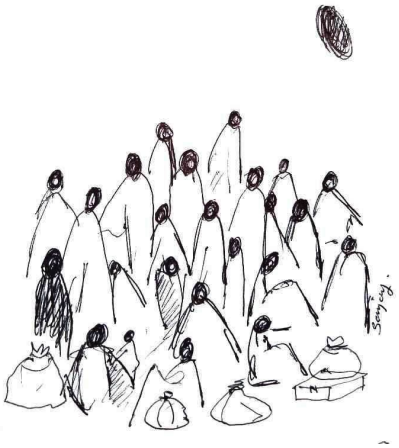

অন্তরালে
মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী

ওরা নিরাকার,
চারিদিকে রেখে গেছে আদিম মানুষের ছাপ,
আর শুধু বিপন্নতার।
রাধাচূড়ার হলদে শাড়ি টেনে নির্বিবাদে চলে শীতের অত্যাচার,
ভ্রমর তখন অনাবৃত শরীরের পাশ দিয়ে চলে যায় দূরে কোন সবুজের বনে।
চাঁদের কালো দাগে প্রকাশিত হয় অনিচ্ছুক প্রকট যৌনতা।

দূর থেকে শোনা যায় ঐ হাহাকার।
তবুও ডুলুং এর ঘোলাটে জলে ফিরে পায় স্বপ্নিল প্রাণের স্পন্দন।
ছলাৎ শব্দে মাছরাঙা ভুল করে তুলে নেয় সাদা শাড়ি।

নির্জন কুঁড়ে ঘরে ঘাপটি মেরে বসে থাকে একফালি চাঁদ,
অ, আ, ক, খ এর তালিম দেওয়া ছেলেটির চোখে পড়ে তারা খসা।
কোকের গনগনে আঁচে ফুটন্ত জলের আওয়াজ ভাসে।
দরজার কোনে সারমেয় তখন অবাক হয়ে কাঁদে।

ব্যাস্ত জনতা আনন্দের চোখে তাকিয়ে দ্যাখে সুডাম শকুন ওড়ে ঐ কুঁড়ে ঘরটার ছাদে।

অচিন পাখি

অসিত বরণ ষড়ঙ্গী

একটা জীবনের গভীরে
আর একটা জীবন তৈরী হচ্ছে
প্রতিদিন
আমি সেই জীবনের কাছে যেতে চাই
কে যেন ডানা মেলে উড়ে যায় বহুদূরে
আলোয় অন্ধকারে
দুলে উঠছে নদী
পাতালে উঠছে কল্লোল
এক অযোনি সম্ভবা নারী
তার শরীর থেকে
খুলে ফেলছে মন্দারের মোলা
পৃথিবীর অক্ষয় অক্ষরগুলো
ঝরে পড়ছে
রক্তের গভীরে
একটা জীবন থেকে আর এক
জীবনে শুধু আসা-যাওয়া
এক অচিনপাখি অন্ধকার মাড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

খোয়াবনামা

স্মিতা বাগ মণ্ডল

এক ফোয়ারায় হাজার জল, গোপন
উদ্গীরণে ব্যস্ত সকাল-সাঁঝ
আমার ঘুড়ির কঠিন ব্যাধি আজ
তোমার লাটাই পথ্য দেবে কখন ?

তোমার পথের মোরাম ধুলোর লাল
আমার গায়ে আঁকলে আল্পনা
উল-কাঁটাতে গরমিল ঘর-বোনা
শুধরে নেবে হয়তো এক সকাল।

আমার আঙ্গুল কলমকারির সুরে
বুনছে 'বেহাগ' রাতজাগা আঁজলায়
নিখুঁত হতো 'গান্ধার' তারানায়
মিললে তোমার 'ঋষভ' এক ভোরে।

সাগর মৃত, সুদের অঙ্ক কষে
শুধুই একলা জাহাজ মৃতপ্রায়
অতীত-কান্না আমার কনিষ্ঠায়
থামবে, তোমার তর্জনীর পরশে।

হবেই শুরু 'আরোহন'-এর গান
'শূন্য' ছেড়ে 'এক'-এর রঙে সাজি
স্রোত-সঙ্গম অনিবার্য আজই
খুশির কেলাস জমাক মহীসোপান।

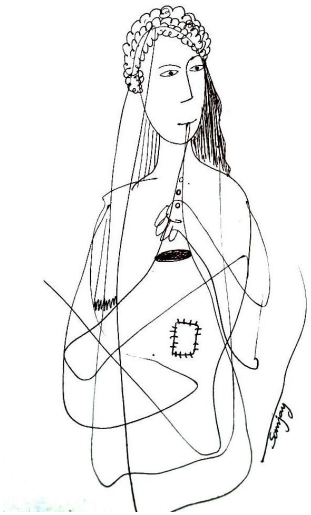

ঠাকুর
বেবী সাউ

আমাদের গাঁয়ে কোন নদী ছিল না।
উঁচু এক খালপাড় পেরিয়ে
একফলা ফসলের জমিন ডিঙিয়ে
খালি গা, খালি পা, রোদে পোড়া শরীর নিয়ে
ঈশ্বর এসে দাঁড়াতেন মধ্যাহ্ন দুপুরে,
দুয়ারে।

জলে ভেজা চিড়ে আর তুলে রাখা দই
বের করে আনতেন ঠাকুরমা।
আমরা দেখতাম—
আসন পিঁড়িতে বসা ক্ষুধার্ত ঈশ্বর,
তাঁর একপাশে পড়ে থাকা খোল,
করতাল আর একশ আট বিষ্ণুমন্ত্র।
দই ভেজানো চিড়ে আর
ঢকঢক করে একঘটি জল খেয়ে
ঈশ্বর আবার বেরোতেন পথে।

ধুলোয় চেয়ে চেয়ে ঠাকুরমা
জোড়হাতে বলতেন,
মঙ্গল হোক।

শস্যের কাছে একাগ্র, নতশির
স্বর্ণেন্দু সেনগুপ্ত

আটচল্লিশ সালের সন্ধ্যে একভাবে আটচল্লিশ সালের
চিৎকারগুলি ভেসে আসে, পিতানাউ . . . পিতানাউ . . .
দেখো, একফালি জমি
আটচল্লিশ সালের যাবতীয় হাসি, তার যা-কিছু সামান্য উপচার
এক টুকরো জমির থেকেও দৃঢ়, যেমন সরলতা, তির ও ধনুকের নিপাট লক্ষ্যভেদ

তবু ডাক আসে, জমিটুকু সন্তানের, কর্ষণযোগ্যতার থেকেও সন্তান অতি প্রিয়
পিতানাউ শোনো, শোনা যাচ্ছে একজন মায়ের টুকরো কিছু ইতিহাস
দুধিয়া তাকে মুক্ত করো বাতাসের মতো, তাকে ফিরাও, যদি পারো অগ্নির মতো ফিরাও তাকে

শস্যের কাছে আরও একাগ্র হয়ে ওঠে তারা
আটচল্লিশ সালের সন্ধ্যে, একভাবে, আটচল্লিশ সালের যাবতীয় উচ্চারণগুলি
ঘর থেকে ঘরে, ভেঙে যাওয়া সম্পর্কের বিচ্ছিন্ন স্মৃতি নিয়ে, একা এই পিতানাউ
এই এক পূর্ণপানি, সোনাহারা সেই সন্ধ্যের দিকে, আটচল্লিশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

বৃংহণ
সুমিত পতি

যে মধুময় অরূপ ছন্দ বাজে তরল বর্ষার ইঙ্গিতে
সেখানে সঙ্গীত বাজে নির্জন; মিথুনে জাগে হর্ষ
সর্পদ্বয় রজ্জুসম উঠিয়া যায় গভীর প্রেমের স্রোতে
আহা! অবোধ কাম, প্রিয় জামপাকা ফল, নিকষ কালো।

বৃষ্টি দিনের বোল, বিষণ্ণ আকাশে লিখে চিঠি
ভাসানে ভেসে যায় পাহাড়ী যুবতীর বক্ষ গৌরব
মাতাল যুবকও আজ মদমত্ত হস্তী; বুকে তার বৃংহণ।

নিয়ে চলো প্রেম প্রিয় বর্ষার ভিজে যাওয়া শিকড় সন্ধানে
মেঘদূত রাগ বাজে আজ পাহাড়ময়; যক্ষ এখনো দুখী আছে।

জীবন সমুদ্রে
বুদ্ধদেব মাহাত

ওপারের ডাক আসে মাঝি নেই খেয়াঘাটে
আকুলপাথারে যাত্রী দিগন্তরেখা দৃশ্যপটে।
খেলাঘর আজ যেন নুড়িমাত্র বিশ্বচরাচর
লবণকণা মাত্র 'আমি' বিভেদহীন আপন-পর।
উৎস-মোহানার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ঘূর্ণনে
দিনযাপন কালস্রোতে খড়কুটো অবলম্বনে।
শুভ্র তুষারকণা সূর্যতাপে গলেছিল ষোলআনা
শোষিত-শাণিত পীড়িত হয়ে বেয়েছে জীর্ণ তরীখানা।
জনসমুদ্রে বাস করে হৃদয় সমুদ্রে ঝাঁপ
মণিমুক্তা নয় অভিলাষ কেবল একটু সূর্যতাপ।
তমসায় জ্যোতির টান প্রার্থনা অবিরাম
পিতা-মাতা-বন্ধু-সখা তিনি সর্বস্ব পরিণাম।
মোহ শুধু নাড়ির বাঁধন লাজ আর পিছুটান
শাঁখের করাত দশায় দোটানায় দেহ-মন-প্রাণ।
মানসিক দৈন্যতায় ভোগ লালসার সাথে সমঝোতা
সাঁতার শেখা শুরু হয় যখন লাথি মারেন কর্তা।
সংসার সমুদ্রকূলে জীবন চলে হেসে খেলে
হৃদিসিন্ধু অমৃতময় কেবল নিজ চরিত্রবলে।

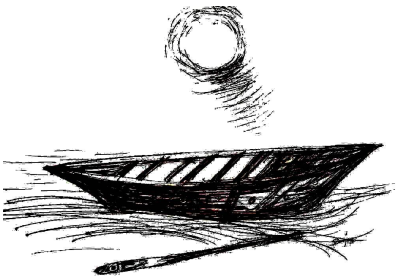

নামহীন সম্পর্ক

রীতা আক্তার (বাংলাদেশ)

কয়েকটি শব্দ
নামহীন অবয়বে আবদ্ধ।
নিশ্চুপ আঁধার পেরিয়ে
পরিযায়ী সময় যাচ্ছে চলে।
কখনো গুমোট পরিবেশ
কখনো অচেনা পথের শেষ।
গল্পেরা ডানা মেলে নীলাকাশে
কবিতারা দেয় ফাঁকি।
অযাচিত স্বপ্নের ভিড়ে
নামহীন সম্পর্কের ছুটি।
কেউ চলে ভালোবেসে
কেউ দেয় ফাঁকি।
চেনা শব্দের ভিড়ে
চেনা মানুষ যায় হারিয়ে।
প্রতিশোধ নেওয়া হয় না আর
ক্ষমা করার রইল না পথ বাকি।
তবুও মানুষ নীরব থাকে
কেউ ঠকে কেউ বা ঠকায়।
অচেনা শব্দের হয় ছুটি
পরিযায়ী সময় খুঁজে ফিরে
একাকী দিন রাত্রি।

মানবতা

সুদীপ্ত বিশাল

মানবতা আজ লুপ্তপ্রায়
ভালোবাসা, সহানুভূতি, সৌহার্দ্যতা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে কংক্রিটের দেওয়ালে
খেলার মাঠ দখল করেছে ঝাঁ চকচকে ফ্ল্যাট বাড়ি।
নব প্রজন্মের শিশুরা জানেনা কাবাডি, হাডুডু, সীতা চুরী খেলার মর্ম,
তাদের খেলা কম্পিউটার মাউসে হাত দিয়ে পাবজি, ফ্রী ফায়ার
এইসব মস্তিষ্কনাশক খেলা।
সফলতার উচ্চ শিখরে ওঠার জন্য,
ইঁদুর দৌড়ে নামিয়ে দিয়েছি আমরা অভিভাবকরা আমাদের শিশুদের।
ছিনিয়ে নিচ্ছে তাদের ছোটবেলার শখ আহ্লাদ।
আমাদের মানবতা আজ হারিয়ে গেছে অর্থ রোজগারের নেশায়।

সম্প্রদান
রাজা ভট্টাচার্য

কি কুড়োও
অস্থির ঢেউতে
কিসের ছবি খোঁজ

বরং ডুবিয়ে দাও
গভীরতা

সমুদ্রের কাছে গোপনীয়তা কিসের
সে তো ছুঁয়ে যাবেই
রহস্য
শরীর
অতীত
অনুভূতি . . .

পারাপার
অভিজিৎ দত্ত

কেঁচোজন্ম পার ক'রে, হে কোদাল,
আমিও মৃত্তিকা,
প্রিয় নারীর সব ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান
ভালোবেসে ফেলি।

শুধু এই নিয়েই রচিত হতে পারে
অজানা সমুদ্রতট, সূর্য, ঢেউ, অবগাহন —

মৃত্যুর গায়ে লেখো শুদ্ধ জলকেলি!

আমার আকাশ আমার প্রকৃতি
সুব্রত দাস

যদি আস্তে আস্তে কাছে চলে আসি
আর যদি দূর না থাকে
তবে মনের শেষ প্রান্তে
দিগন্ত রেখায় দাঁড়িয়ে
আমার আকাশকে ছুঁতে চাই।।

যদি নিরবতা ভাঙ্গে
চোখের দৃষ্টি, যদি উন্মোচন করি
বুকের ভিতরের পর্দা –
তুমি যেন পড়তে পারো – পড়তে পারো
অক্ষরের জড়াজুড়ি ভাষা
তাহলে তোমার বুঝতে অসুবিধা হবে না
সমস্ত অধিকার তোমাকেই দিয়ে রেখেছি
কারণ প্রকৃতি তোমাতেই তো আমার বেঁচে থাকা।।

শূন্যতা তো চারিদিকে ছেয়ে আছে
কত আপনতা যায় আর আসে
শুধু তুমি বলেছিলে —
আমি যাব না কখনো
শুধু সেই তুমি আছ কাছে।।

তুমি কথা রেখেছো
বসন্ত তুমি ফিরে এসেছো
বর্ষা তুমি আমার রুক্ষতাকে ভিজিয়েছো
আমার নিঃসঙ্গতায়
বাহারী মরশুমি ফুলের প্রলেপ দিয়েছ
যোগান দিয়েছো
আমার সমস্ত পাথেয়
তুমি আমাকে
অক্ষরে অক্ষরে বুঝিয়েছো
কিভাবে তুমি আছ
আমার অন্তরে বাহিরে
আমার হৃদয়ের মাঝে
তুমি জেনে রেখো আকাশ
তুমি জেনে রেখো প্রকৃতি
আমি তোমাতেই বেঁচে আছি।।

পৌষমাসের গল্প

দেবাশিস দন্ড

লম্পট মোরগটা ডাকছে
রগ ফুলিয়ে ডাকছে
সুদাম মাহাতর খামার থেকে ডাকছে।

তার মানে রাত বারোটা বাজল
পড়শিবাড়ির গিন্নিমার চোখে ঘুমের নবান্ন
ঠিক বারোটায় ঘুমের বারোটা বাজল।
গিন্নিমা রাগ করছে
বৃদ্ধ বাবুমশাই বলছে - আহা ডাকুক
বুঝতে পারছ না সময় এখনও চলছে!

পানকৌড়ি দিন।
সপ্তমুখী নদী পেরোনো দিন।
সিঁদুর সিঁদুর সুন্দরীফুলের দিন...
বাবুমশাই তখন ছোট্ট চিতল হরিণ
মোরগডাকা মধ্যরাতে হরিণশিশু
হেঁটে যাচ্ছে গরানের জঙ্গলে।

মোরগটা আবার ডাকছে
ঘড়ির কাঁটায় ঝুলে আছে রাত আড়াইটা
ঝনঝন করে রাত ভেঙে আড়াইখান হচ্ছে
রাত ভাঙছে...
পড়শিবাড়ির গিন্নিমার ঘুম ভাঙছে...
গিন্নিমা রাগ করছে।
বাবুমশাই বলছে – আহা ডাকছে ডাকুক
বুঝতে পারছ না সময় এখনও চলছে!

পূবডাঙায় আলো জাগছে
ল্যাম্পপোস্টের আলো খাচ্ছে
আলো এসে আলো খাচ্ছে
পাঁচটা তিনের লোকাল যাচ্ছে
সেই মোরগটা আবার ডাকছে।

পড়শিবাড়ির গিন্নিমা পাশ ফিরছে
ফিরতে ফিরতে রাগ করছে।
বাবুমশাই বলছে — আহা ডাকছে ডাকুক
বুঝতে পারছ না প্রহরে প্রহরে
সময় এখনও চলছে!

এটা সারা পৌষমাসের গল্প
পৌষমাসের রাতজাগা গল্প
সংক্রান্তির রাতে বাবুমশাই বললেন —
বারোটা পেরিয়ে যায় আড়াইটা পেরিয়ে যায়
মোরগ ছোঁড়াটা ডাকে না কেন ?
পড়শিবাড়ির গিন্নিমার গোলাভরা ঘুম
সারারাত সাড়া দিল না।

পাঁচটা তিনের লোকাল চলে গেল
বাবুমশাই বলল — মোরগটা ডাকে না কেন ?
গিন্নিমা বলল — সময়টা থেমে গেছে গো
কুসুমবেড়ার লড়াইয়ের মাঠে
মোরগটা কাল পাহুড় হয়েছে।

প্রতিবাদী হাত

পতিতপাবন মাহাত

মনটা না চাইলেও
ক্লান্ত, অবিশ্রান্ত শরীরটাকে নিয়ে যেতেই হচ্ছে
সেখানে।
ভগ্ন পা!
শত কষ্ট উপেক্ষা করেও
খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঠিকই পৌঁছে যাচ্ছে সেই
জায়গায়।
চোখে ঠিক দেখতে পাচ্ছি না
তবুও দৃষ্টি প্রসারিত করে যেতেই হচ্ছে সেই স্থানে।
যেখানে হাজার হাজার মানুষের ভিড়,
মুখরিত কোলাহল, আর —
কত শত প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

মন না চাইলেও
মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে
তুলতেই হয় ক্লান্ত অবশ হাতখানি।
আমি না বুঝলেও
যাতে সবাই বুঝতে পারে —
আমিও প্রতিবাদী, আমিও বিদ্রোহী!!
না হলে লোকে কি বলবে!
সমাজে মুখ দেখাবো কি করে!
যারা সমাজের মাথা,
লোকে না মানলেও, যারা মড়ল বলায়
তাঁদেরই বা বলব কি!
অন্ধের তবু যষ্ঠী আছে
অসহায়ের তো কিছুই নাই।
কিছু লোক নিজ স্বার্থান্বেষণে লোক জড়ো করে;
আর কিছু লোক কিছু না বুঝেই
সেই মিটিং-এ,
সেই মিছিলে সংখ্যা বাড়ায়
বলে — ''প্রতিবাদ টা করতেই হবে।''
কিসের প্রতিবাদ ?
ক্ষুদ্র স্বার্থের ? না কি বৃহতের ?
কার জন্য প্রতিবাদ ?
সার্বজনীন হিতার্থে ?
না কি কারো একার অর্থাগমের জন্য ?
আমি তো মুখ্যু-সুখ্যু লোক
আমি তো কিছুই বুঝি নাই।
আর ওরা —
ওরা হয়তো কিছু বুঝে।
সবাই তো আর আমার মতো মুখ্যু নাই।
তাই ওরা যখন হাত টা উপর দিকে বাড়ায়
আমিও তখন আমার হাত টা উপর দিকে তুলি।
আমার প্রতিবাদী হাত টা তুলি।।

এলোমেলো জীবনে

বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত

সময়ের স্রোতে ভেসে-চলা,
আমি পথ ভোলা পথিক।
সম্পর্কের বেড়াজালে,
অস্পষ্ট সামনের মাইলস্টোন।
উপপাদ্যের জটিল সমীকরণ,
মেলে না বাস্তবের না লেখা কাগজে।
হালকা শীতলতার মাঝে,
কখনো উষ্ণতার ছোঁয়ায়,
জেগে ওঠে হারানো অনুভূতিগুলো।
ঘন কুয়াশার বুক চিরে,
জেগে ওঠে,
নিভু নিভু প্রদীপের শেষ বাতিটুকু।

বীজের অঙ্কুরোদ্গমে,
হঠাৎ একপশলা ভালোলাগার অনুভূতি।
অদ্ভুত আবেশে মুগ্ধতার আগমনী বার্তা।
স্বপ্নের দেশে সে ছিল বসন্তের কোকিল।
পাশে বসার, ছুঁয়ে দেখার আকুতিতে,
দিন কেটেছে অবহেলায়।
স্বপ্নের সওদাগর হতে চেয়েছি বারংবার,
বুঝেও অবুঝ ছিলো,
ক্যানভাসের মোনালিসা।

...

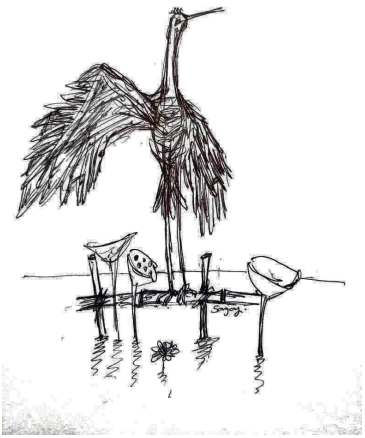

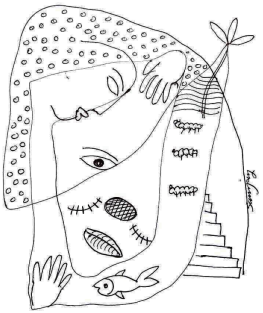

...

টানা চোখের বিলম্বিত লয়ে,
আমি সপ্তসাগর পাড়ি দিয়েছি।
নাবিক হয়ে হাল ধরেনি তবুও।
মাঝের বিবর্ণ সন্ধ্যায়,
অনেক খুঁজেছি তাকে।
নিরাপদ আশ্রয়ে,
সীমাহীন আমোদের ঠিকানা,
পেয়েছি শুনেছি।
লড়াইয়ের ময়দানে ভোঁতা তরবারি নিয়ে,
লড়াইয়ের মাঝেও, সন্ধ্যা আকাশে,
শুকতারা দেখেছি কতবার।
শুভ্র ওষ্ঠাভরনে, কালো তিলে,
এঁকেছি হাজার বাতি।

আজ অপরাহ্ন সমাগত প্রায়,
সকল তৃপ্তির মাঝে অতৃপ্তির মানসিকতা।
না পাওয়ার আবিষ্ট অমলিন যন্ত্রণা।
ইচ্ছে ডানাগুলো উড়িয়ে নিয়ে যায়,
বিস্মৃতির অতল গহ্বরে।
বোঁটা ছেঁড়া ফুলকে বুকে জড়িয়ে ধরি,
কানে-কানে চুপিসারে বলি,
নকশীকাঁথার মাঠের না বলা গল্পকথন্।
সামনের হিমালয়কে তুচ্ছ করে,
চলো বাসা বাঁধি,
প্রান্তিক সীমানায়।
যেখানে আজও নামতা শেখান,
আমাদের ভালোলাগার দিদিমণি।

জানুস খুড়া

সুব্রত কর্মকার

জানুস খুড়া...
কিলাস ফাইব হবেক ব,
খুউব ছুট্টু বেলা
পড়হা, চরহে বেড়ান,
সকাল দুফর খ্যালা...
পুখুরে লাফাই ঝাঁপাই সিনান,
ডুব সাঁত্যার
ফুড়িং ধরা, রিং ছুটান,
স্যা অনেক ব্যাপার

ইকদিন ব চইখ মুহুখ
লাল হঁয়ে গেল কাশ্যে
খক্‌র খক খকর খক
যা হয় নাই বারমাস্যে।
যখন হামি শুল্যম
কাঁথ কৈলে মাথা রাখ্যে
হামার গটা গায়ে
ফুটকি ফুটকি দাগ দ্যাখে ...
মা বইল্ল্য, তর বাইরে যাওয়া
নাই চলব্যাক।
হামি বইল্ল্যম, কেনে ?
পাড়হাগুলার কি হবেক ?
গা ট ব্যাদম কাঁইপছিল,
পা টলটল কইরছিল ব
বাপ বইল্ল্য — মায়ের দয়া হইছেরে,
মাও বইল্ল্য, হঁ।
সেই য্যা ঘরহে, খাট্যে শুঁয়ে
ইকুশদিন ইপাশ, উপাশ
নাই দিলহ বিরাতে, নাই বইল্ল্য,
যা পারুস খাস।
ভাইবছিলম তেঁতুল শুঁটি
নুন লংকা দিয়ে মাখ্যাই
ঘরের পিছানে ধারিটায় বইসে
চুষ্যে চুষ্যে খাই।

বাপ বইল্ল্য, কি ভাবছুস কুনু ?
হামি বইল্ল্যম, ইস্কুল...
ঠিক বইল্ল্যে রইখ্যা ছিল!
থাইকতক নাই চুল।
সিদিন কি জাইনতম,
উটা সংক্রামক মহামারী ?
পাল্যেছিলম বাপমার কথা,
তাই ত চইলেছে তরী।
রাইত দিন এক কইরে দিছিল
মা বাপ হামার
ইমন সেবা যত্ন ব,
ইকেবারে নার্স অ ডাক্তার।
সারা পাড়া পাল্যেছিল,
সারা পাড়া ঐ কদিন
হামার, সবার মঙ্গলের জন্যে,
ভুলি নাই সিদিন।

জানুস খুড়া, ঐ পালনটাই
কোয়েরেনটিন বঠে
না মাইনল্যে কত য্যা ক্ষতি,
কত অমঙ্গল ঘটে।
ইখন ত ভাবি সরকার যা বইলছে
বাপমার মতই
মুখ ঢাক, ঘরে থাক, হাত ধু,
কাজ থাকুক যত্যই।
বাইরে ত বিরাতেই হছে,
প্যাট ত আর কথা নাই শুনব্যাক
দকানে দুরলে দাঁড়হাই ভাবি,
কারঘাড়ে কখন চাইপব্যাক।
লিজের হাতটাকেও ভয় পাছি ইখন,
জানহ ব খুড়া
পঁয়তাল্লিশ বছর কাট্যে যাওয়া
মানহেই আধবুড়া।

অদ্ধেক জীবন টা হাঁস্যে হাঁস্যে
কাটহেই গেল্য মিলে মিশ্যে
ইখন দ্যাশে দ্যাশে ইত হাহাকার দ্যাখে
বল ন হাঁইসব কিস্যে ?
বল ন খুড়া ...হাঁসি পাবেক ?
হাঁসতে মন যাবেক ?
শুধু ভয় হছে, লিবেক, এই লিবেক,
এই লিবেক।

খুড়া ব ইকটা গান বাপ গাইত
মনহে পড়হে, হঁ
আমরা কইরব জয় নিশ্চয়
শুইনলেই বুক ট ব
সাহসে ভৈরে যায় ...
তবহে যতই আসুক করোনা
মাটি কামড়ে বস্যেই থাইকব ঘরে
সে হামার জানা।
ইকুশদিন কাটহাইছি ব ঘরে
ইপাশ, উপাশ কৈরে
নাইলে উপরে সগ্গ, লীচে লরক ব
যখন যাব্য সৈরে।

মোরগের ডাকে

প্রসাদ মল্লিক

জমে থাকা অন্ধকারের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গে
সুদীর্ঘ একটা আওয়াজ,
মৃদু সূর্যকিরণ বিশ্লেষণ করে ক্লান্তিহীন-নতুন সকালের;
দিনভর কর্মযুদ্ধের সূচনাপর্বে এই শাণিত আওয়াজ
স্মরণ করায় পাঞ্চজন্য'র অভিসন্ধি;
শুরু হয় ঘুম ভাঙার উৎসব।
একে একে সামিল হয় সবাই!
শুরু গরহাজিরির তালিকা ভরায় গতরাতের নিরীহ ক্ষুধা।

নিরপেক্ষ অভিনিবেশ জানান দিল, সে শরীর আজ প্রাণহীন।

ব্যবধান

মধুমিতা দত্ত সিংহ

গভীর অসুখে ভুগছে পৃথিবী
মানুষে মানুষে বেড়েছে ব্যবধান।
সামাজিকতা দূরত্বে বিধি নিষেধ
সুরক্ষিত রাখতে সকল প্রাণ।।

অদৃশ্য দানব থেকে রক্ষা পেতে
সামাজিক দূরত্বে থাক ব্যবধান।
মানুষের পাশে মানুষ থাকুক
বেঁচে থাক মনের আত্মিক টান।।

দূরে থাকা নতুন তো নয় আজ
অসুখের আগে কি ছিলনা এ ভাব ?
মানুষে মানুষে বেড়েছে মনের দূরত্ব
পাশে থাকা মানুষের বড়ো অভাব।।

খোঁজ নিইনি আমরা প্রিয়জনদের
মগ্ন থেকেছি নিজের স্বার্থ চিন্তায়।
অসুস্থ প্রিয় মানুষ হয়তো বা ছিল
পথ চেয়ে তোমার আমার প্রতীক্ষায়।।

বয়স ভারে ক্লান্ত বাবা মার পাশে
মনে আছে ? বসেছো কবে শেষ বার ?
বলেছ বাবা মা তোমরা কেমন আছো ?
চলোনা হাত ধরে হাঁটি আরেকবার।।

বয়সভারে অসুস্থ মা তোমার তরে
উপোস ব্রতে যখন দিনের শেষে।
খাবার নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছো ?
তারও মুখে খুশীর ঝিলিক ভাসে।।

এ অসুখ সারাতে ব্যবধান থাক
ব্যবধান থাক সামাজিকতায়।
সুস্থ হোক আবার বিশ্ব বসুন্ধরা
দূরত্ব ঘুচে ভরুক ভালোবাসায়।।

পাশে না থেকেও যায় কাছে থাকা
কাঁধে রাখা যায় ভরসার হাত।
যন্ত্রমানব নয়, হই সত্যিকারের মানুষ
জীবন থাকুক মানবিকতার সাথ।।

অসহায় যত অনাথ আতুর
হাতে হাত রেখে হই সমব্যথী।
ঘুচুক ব্যবধান মানুষে মানুষে
তবেই মানব হবে শ্রেষ্ঠ জাতি।।

লড়াই

শাশ্বতী হোসেন

কন পত্রিকা থাক্যে আসছেন স্যার ?
কিছু কি শুধাচ্ছেন বঠে ?
আইজ্ঞা হামার নাম –
নামটঅ জান্যে কি কইরবেন ?
যন গাড়িটয় চাপ্যে আস্যেছেন, -
শহর তক্ যাথ্যে যাথ্যে হামার নাম ভুলে যাবেন।
ক খ লে চন্দবিন্দু তক্ যা হোক
বর্ণ লিয়ে সাজায়ঁ একটঅ নাম দিন,
হঁ হঁ, যে কনো নাম হলেই হব্যেক।
হামদের খবর কে শুন্যেছে বলেন দেখি ?
দেহাতি, দলিত টাঁইড় আদিবাসি বঠি।
হামদের লিয়ে তামাশা হয়, চুটকি গান হয়
কিন্তু হামদের অপমান বেদনা
আপনাদেরকে কুনোদিন বিঁধব্যেকই নাই।

অ্যাতঅ বার শুধাচ্ছেন য্যাখন –
নামটঅ লিখ্যে নিন স্যার।
বাপ বড় আদর করে নাম রাখ্যেছে 'মণি'। পদবী- কোটাল। শিক্ষাগত যোগ্যতা- মাষ্টার ডিগ্রি।
নিবাস- শালবনি। জাতি- শবর।
ধর্ম- হিন্দু
অ্যাই দেইখেছেন –
ইদিক সিদিক থাক্যে যিভাবে হোক
ধর্মটঅ চলে আসব্যেকই।
ঠিক য্যামন ভটভটির লাইট দেখ্যে
জমিন লে ধানপকাণ্ডলা ছুট্যে আস্যে।

আর চেহরার অবস্থা দেইখছেন ত,
কালহ কুচ্চা রঙ, থ্যাবড়া নাক
পুরু ঠোঁট। শক্ত কাঠের পারহা হাত-পা।
ছিবড়া গতর।
আপনাদের পাশে দাঁড়াতে লিজেরই সরম লাগে।
ত ইসব কথা ছাড়্যে আসল কথাটঅ বলি –
হামদের বাপ-দাদারা জঙ্গল লে সাপ ইঁদুর খরগোশ কটাস বনখুকড়া শিকার ধর্য্যে আইনত
খালে কাঁকড়া-মাছ ধইরত।
ছুটঅ ছিল্যারা গুলতি দিয়্যে কাক-পাখি মার্য্যে
আগুনে ঝলসায়ঁ খাইত্য।
গ্রায়ের মরদ- বউ হাঁয়ড়া বনাত্য।

ইসব দেখ্যে বাপকে বললম, হামি ইসকুল যাব্য।
হামকে ভর্তি কর্য়ে দে।
বাপ ইসকুলে ভর্তি কর্য়ে দিল্য।
মাস্টরবাবুরা হামার কাছকে পড়া লিত্য নাই।
উয়াদের কাছকে গেলে, দুর দুর কর্য়ে ভাগায়ঁ দিত্য।
বইলত্য, পালা পালা, তর গায়ে পচা মাংস বাসাছে।
হেডমাস্টার বলেই দিল, হা শুন মনি কোটাল,
তুই ছুটঅ জাতির মিয়া বঠিস। ইয়ার পর চোর, ছ্যাঁচড়ের বদনাম লিয়ে ঘুরিস।
হামদের উঁচা জাতির পাশে তুদের কুনোভাবে
অ্যাডজাস্ট হব্যেক নাই।
তা বাদে, তুরা লিখাপড়া শিখলে
বরামদেবী রুষ্ঠ হব্যেক। শাপ দিব্যেক।

বাপ সেই ইসকুল লে ছাড়ায়েঁ
ধুরের ইসকুলে ভর্তি কর্য়ে দিল্য।
সেই থিকে অনেক কষ্ট সয়ে জিদ কর্য়ে লিখাপড়া শিখেছি।
বিশ্বাস হবেক কিনা জানিনা,
বরামদেবী শাপ লাগ্যেছে, না, উঁচা জাতির অপমান — বুঝি নাই।
আজ তক মনে সুখ পাই নাই, শান্তি পাই নাই।
তভে চাকরি পেলম।
গ্রাম- সমীক্ষকের পদ। চাকরি কইরতে কইরতে
মাষ্টার কোর্সে অ্যাডমিট হল্যাম।
দিন কে দিন অপমান হত্যে হত্যে
কোর্স কমপ্লিট কইরলম।
উঁচা সমাজের উঁচা নিয়ম নীতির বিচারে
প্রতিষ্ঠান সার্টিফিকেট দিল্য নাই।
প্রফেসর বইললেন, মাষ্টার কোর্সে স্টাডি করার
অধিকার শবর মহিলাদের থাকতে পারে না।
আমি অবাক হয়্যে শুধালম,
তাইলে কি অধিকার থাকব্যে স্যার ?
কেন ? তোমরা যা করো। চুরি-চামারি না করে
মাছ-কাঁকড়া ধরবে। জঙ্গলে কেন্দুপাতা তুলবে।
ছাতু কুড়াবে। নিম দাঁতন ভেঙে হাটে বিক্রি করবে।
আরো কুৎসিতভাবে হেসে বইললেন,
পুরুষের সাথে হাঁড়িয়া-মহুল খেয়ে
নাচবে, ফুর্তি করবে।

অধিকারের লড়াই চইলছে চইলবে।
ই লড়াইয়ে জিতব কিনা জানিনা,
তভে হামদের গাঁয়ে ইসকুল হয়েঁছে,

ছিলামিয়ারা পড়তে যায়।
মরদরা জনমজুর খাট্যে। শহরে ব্যবসা করে।
জমিন খাট্যে। জঙ্গল বাঁচায়।
হঁ স্যার, হামি শবর মিয়া বঠি।
অনেক কষ্টে ডিগ্রি পায়েঁছি।
আপনারা বড় পত্রিকায় রিপোর্ট লিখেন।
উপরমহলে আপনাদের দমহে খাতির।
হামার ডিগ্রির কাগজপত্র দিত্যে বলুন না স্যার..
ডিগ্রির কাগজ হামার গাঁয়ের লোকজন দেইখবে।
ওরা জাইনবে, মনি বাঘের পারহা লড়াই কর্য্যেছে।
গাঁ-মাটি জাইনবে, জঙ্গল জাইনবে।
গাঁয়ের ছিলামিয়ারা
জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে
আকাশটকে চিন্যে লিতে পাইরবেক।

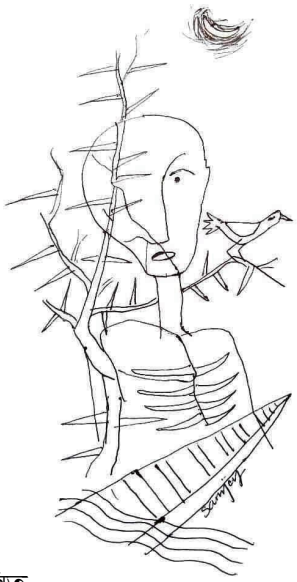

সুরুচি

জয়দেব নন্দী

দুবেলা পর্যাপ্ত অন্নে পেট ভরে,
যথেষ্ট পোশাকে আচ্ছাদিত শরীর,
তাই নগ্ন বলে না লোকে।

কিন্তু, সব নগ্নতা কি চোখে দেখা যায় ?

আমি সজ্ঞানে জানি আমি নগ্ন।
নগ্ন হতেই আমার বেশি ভালো লাগে।
নগ্নতার আতুড় ঘরে আজ সভ্যতা লালিত—
তাই তো বলি, এ সবই চোখের ভুল।

এখন মধ্যরাত্রি, তুমি অন্য পুরুষের বক্ষলগ্ন,
অথবা, রসময় ফোনালাপে 'মশগুল'।
আমি এপারে অনন্ত প্রতিক্ষায়,
''ইয়োর কল ইজ অন ওয়েট।''

কবিতা 'সমঝোতা' জানে না
কবিও না।
তাই তো কবির কোনো দেশ নেই,
জাত নেই,
পোশাক নেই,
কবির অরুচিও নেই।

ভূত

প্রদীপ বটব্যাল

নিঝুম রাতে
যদি না ডাকে ঝিঁ ঝিঁ পোকা
গা'টা ছমছম করে ওঠে!!
হঠাৎ ক'রেই যদি
গাছের ওপর থেকে
কুঁক ক'রে ডেকে ওঠে
তখনই ভয়ে
যেন পিলে চমকে ওঠে
মুখটা শুকিয়ে
জিভটা চটচটে
আঠায় ভরেই যায়!!

গভীর রাতে
যদি ঘুম না আসে
এদিকে মনে
ভূতের ভয় খুব
চেগে ওঠ
যদি ঠিক তখনই
ঠুকুর ঠুকুর
লাঠির আওয়াজ
কানেতে ঘা দেয়
তখন কেমন মজা হয় ?
ডাকো নাকি
ভয়ের চোটে
রামসীতাকে
গেয়ে চলিস নাকি
তুলসিদাসের সুরে
বুকেতে আছে আমার
রামলক্ষণ ওরে,
তুই ভূত একটা
আমার পূত ওরে।

বিটি ছ্যাইলার ব্যাথা

অজিত কুমার রাউৎ

আমি বিটি ছ্যাইলা বঠি
আমি মনকষ্টে দমে ভুগি;
কর বেহা বইলছে বাপে মাঁয়ে-
পাহইরাঁয় গ্যাল পোনরো বছরে
রাইখব নাই আর ঘটে ও ঘরে।
পইড়ে শুইনে হরেক কী ?
পরের ঘরের হবি ঝি।
হেঁসাইল ঠ্যালোঁ গতর খাটায় যাবিস সব ভুলিঁ।
পাবিস কী আর ছকরা ছ্যাইলা ?
কামায় দমে লগদ টাকা।
ফসকায় গ্যালে নাই পাব এমন দামে দরে -
হঁয়ছে পছন্দ বিইগড়াইস না ঘটে।
জুটালি বর দিব বেহা-
শুইনব লাই কারঅ কথা।
বিটি আমার বঠে -
আইন আমার কী কইরবেক ?
বেহা দিয়েঁ মাথার চাপ কমাব
অত সইকল লদেঁফঁদে নাই থাইকব।
ফেপাঁয় ফেপাঁয় ঘুইরবেক লেখাপড়হা শিখিঁ

বয়স যাবেক পড়িঁ গাল যাবেক তপড়িঁ।
বেহার বাজার যাবেক নামি
কইরবেক নাই পছন্দ আর তোখে ভালিঁ।
ভালয় ভালয় করিঁ লে বেহা
তুই য্যা মাঁয় অবলা বিটিছানা।
বিটিছানা ফুপাঁয় ফুপাঁয় কাঁদ-এ ঘরের কুনে,
চইখের জল চইখে মর-এ রা কাড়ে না মুখ-এ।
ভাইবতে বইসে দিন-এ রাইতে -
বস-এ না মন কন-অ কাজ-এ
লেখাপড়া সইকল গ্যাল জলে,
বিটি ছ্যাইলার এমন কপাল বঠে।
ব্যারাম হবেক দমে জানি
শরীর আমার যাবেক ধসি,
স্বপন আমার সইকল যাবেক থামি।
ব্যাটা ছ্যাইলা স্ফূর্তি উড়ায় কপাল ফাটায় বিটিটার
রাজি হয় ক্যানে তারা নাবালিকা বিহা কইরতে ?
বুঝিছিল বিদ্যাসাগর কাঁদিছিল বেজাঁয় বঠে
বাইল্যবেহা রধের লাগিঁ দিল বেহা নারায়ণে।
একবিংশ শতিক আইল তবু ক্যানে এমন বঠে,
দমিঁ যাছে আইন-কানুন বজ্র আঁটনি ফস্কা গেরো
জাগাঁয় দাও সইকলে বেহা ক্যানে অকালে-
বিটিছানা আমাদ্যার গুইমরে ক্যানে কাঁইদরে ?

বাঙালিয়ানা

রিম্পা ষড়ংগী

বাঙালি আমি ইংরেজীটা
ঠোঁটের ডগায় ভাসে
বলতে কথা বাঙলা ভাষায়
অনিচ্ছেটা আসে।।
বাহারিপনায় নিত্য মাতি
ইস্টাইলেই ঝোঁক
হলিউডের ট্রেলার মাঝে
নিত্য ফেলি চোখ।।
বাঙলা ভাষার বইকে ভুলি
ইংরেজীতে ঝুঁকি
কঠিন কিছুর ওয়ার্ড মিনিং
ডিকশনারি উঁকি।।
অফিস চলি, পোষাক আশাক
কথার ধরন ধারণ
বাঙালিয়ানার লেশ টা ত নেই,
নেই ত কিছু স্মরণ।।
বাঙালি আমি, তাই ত আমার
বিরিয়ানির লোভ
বললে লোকে ভেতো বাঙাল
উগরে যে দিই ক্ষোভ।।
কথায় কথায় ফুলঝুরি ত
হিংলিশেরই বুলি
বলছি কথা দেদার চ্যাটে
বাংলা কথা ভুলি।।
হায় বাঙালি নকল করায়
জুড়ি যে নেই তোর
মোটা টাকার মাইনে পেলে
অহংকারের ঘোর।।

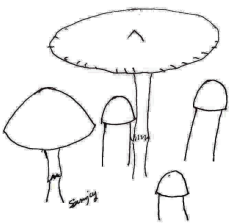

ছোটাস গাড়ি ইচ্ছেমত
রেস্টুরেন্টে বিল
দেখাস বড়ই সাহেবপনা
পায়ের জুতোয় হিল।।
মেয়েরা ত আজ স্কিনি ড্রেসেই
ভীষণ কম্ফর্টেবল
পরলে শাড়ি আঁচল কুঁচি
উঃ কি আনম্যানেজেবল।।
বাংলাটাকে পর করে দিই
ভান টা দেখাই ইংলিশি
অবাঙালিই বন্ধু বেশি
তাদের সাথেই খুব মিশি।।
নলেজ টা যে ভাসা ভাসা
ইংরেজীতে নেই দখল
বাংলাটাকে আউট করে
ভোজপুরি টাই অনর্গল।।
বাচ্চারা ত শিখছে না ত
বাংলা কথা আর
ফরেন ফেরত বাবা মা যে
ভোলেন দেশাচার।।
ফাংকি ফ্যাশন চুলের ভাঁজে
অত্যাধুনিক স্টাইল ক্যারি
কালচারটা গড়েই তুলি
বাংলা থেকে করুক ভ্যারি।।
পরছে শাড়ি বঙ্গ নারী
উৎসবেরই মুহূর্ত
কথার ভাষায় বাঙলাটা থাক
পাক যে সমান গুরুত্ব।।

যোদ্ধা তুমি
তমাল চক্রবর্তী

অদৃশ্য সে প্রায় তবু তার করাল গ্রাসে সব দেখা যায়।

আচ্ছা সাম্য দেখা যায় ?
উঁচু নীচু সব অঙ্ক মিলে একে একে আসে প্লাস্টিকে মোড়া অস্পৃশ্য লাশ হয়ে।
গ্রাম শহর দেশ দেশান্তরের প্রাচীর ভেঙে নিঃশব্দ মৃত্যু হাতছানি দেয়।

দাসত্ব দেখা যায় ?
ক্যালেন্ডারে বাড়ছে সংখ্যাটা, তবু তা মানে না অবুঝ পেট।
এক টুকরো রুটি না অদৃশ্য অনুজীব!
ইচ্ছে মতো পথচলার ভাবনা বড়ই অলীক।

আর, ভালোবাসা দেখা যায় ?

তবু লড়াই চলে।
প্রাণপণ চেষ্টা চলে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুলতে।
মাঝে মাঝে শিয়রে তাদের ঘনিয়ে আসে চিরঘুম।
এই যে প্রাণ দিয়ে প্রাণের সংরক্ষণ;
জানান দিল ভালোবাসা আছে মানুষের জন্য মানুষের চোখে।

যোদ্ধা তুমি ঘুমাও আজি।

তোমার পবিত্র দেহের বিনিময়ে বেঁচে থাক অজস্র হৃদস্পন্দন।

তবু যদি জাগে ঘৃণার বদলে ভালোবাসা চিরন্তন।

বিষাক্ত ছোঁয়া
সমীর শীট

জীর্ণসভ্যতার বুকে দেখি দগদগে ঘা
তা থেকে ঝরছে ফোটা ফোটা রক্ত,
হয়তো কোন বিবেকহীন পশুর পৈশাচিক আঘাত।
কিন্তু ক্ষত বলে অন্য কথা,
এ কোন বুদ্ধি সম্পন্ন জীবের ইচ্ছাকৃত আঘাত।
তাই ধীরে ধীরে সবার চোখের আড়ালে
সভ্যতার ঢলে পড়ছে মৃত্যুর কোলে।

সেই ক্ষতের এক ফোটা রক্ত বিন্দু পড়লো আমার হাতে
নিমেষেই হাতটা যেন দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো,
স্পষ্ট দেখলাম সেই রক্তে মিশে আছে
সভ্যতা পুষ্ট মানুষের বিষাক্ত লালা।

অ-কথার সাম্পান

কমলিকা দত্ত

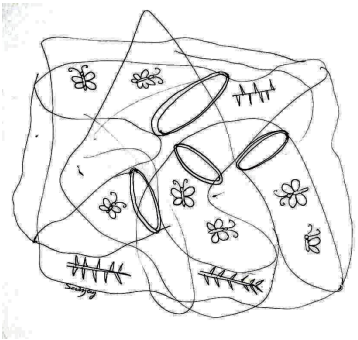

আমি কবি নই, আগেও বলেছি অনেক অনেক বার,
আঙুলে বৈঠা টেনে টেনে করি কথাদের পারাপার...
তোমাদের সাথে কথা বলারই তো অজুহাত
— এই কলম
কবিতা লেখা তো অনেক হয়েছে যুগযুগান্ত ধরে,
বাকী থেকে গেছে —
হৃদয়ের বহু অলিখিত দেওয়া নেওয়া...
চলো না— এমনি করেই
তোমার গল্পে আমার গল্প জুড়ে
আরো কাছাকাছি আসি...
আমি, কথা ফেরি করে করে,
অকারণই যদি তোমাদের ভালোবাসি,
দেবে কি আমায় ফিরিয়ে ?
আমি ফিরে গেলে আমার সঙ্গে কত কথা যাবে হারিয়ে!
এসো না, চলমান স্রোতে, জলজ বিহারে,
মিশে হই একাকার...
শব্দে -কল্পে ঢেউ তুলে দিই,
বাঙ্ময় উপহার।
আমি কবি নই, আগেও বলেছি অনেক অনেক বার,
আঙুলে বৈঠা টেনে টেনে করি কথাদের পারাপার...
এইদিক থেকে ওদিকে,
ওইদিক থেকে এদিকে — খানিক
অনুভূতি বিনিময়...
যদি ভেবে থাকো মরমী বন্ধু
সেইটুকু পরিচয়।।

আজ

অনুরাধা কর্মকার

আজ রাতের মতো অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন,
স্রোতহীন নদীর মতো হয়েছে মন।
পথে আজ রয়েছে অজস্র কাঁটা,
এই কাঁটা পদতলে ফুটেছে বারবার।
আর দুই চোখ দিয়ে বয়ে চলেছে অশ্রু জল,
তবু আজ পাষাণের মতো হয়নি যে মন।
স্বপ্ন ছিল অনেক এই চোখে,
আজ সব স্বপ্ন ধুয়ে গিয়েছে চোখের জলে।
তবু মনের মধ্যে ভালোবেসে বেঁধেছি যে ঘর,
আজ তাই কাউকে মনে করি না পর।

মিষ্ট খবর তিক্ত জবর

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

''জেলাতে ফাস্ট হয়েছো,
নাম নেই রাজ্য মেধায়!
এটা কী রেজাল্ট হোলো ?
রেগে মা ছেলেকে শুধায়।।

অঙ্কে নিরানব্বই!
একশ' হোলো না কেন ?
ইংলিশে ঊননবব্বই!
আর পাঁচ দিলো না কেন ?

বিজ্ঞানে অজ্ঞান নাকি ?
শ'-শ' পাবার কথা।
তার বদল নব্বই ক'রে
হেঁট হোলো মোদের মাথা।।

ইতিহাস, ভূগোল খাতা
দেখেছে কোন্ শয়তান ?
দশ-দশ বাড়তো আরো
দেয়নি সেই বেইমান।।

বাংলায় বিরাশি পেলে,
মাথায় মাথায় লেটার হোলো।
তুমি না আমার ছেলে,
কি ক'রে মুখ দেখাই বলো ?

শারীর ও কর্মশিক্ষা
ডোবালো চেটো জলে
দুটোতেই কম নাম্বার
দিয়েছে প্র্যাকটিক্যালে।।

সবেতেই লেটার বলে
হাসছো হ্যা-হ্যা করে।
এ লেটার পেয়েছে অনেক
দেখোগে গো-ছাগলে।।

আজ থেকে বিশ ঘন্টা
পড়া চাই কাঁটায় কাঁটায়।
আর বার রাজ্য মেধায়
শ্রীমানের নাম থাকা চাই।।

জয়েন্টে র‍্যাঙ্ক থাকা চাই
একেবারে প্রথম দিকে।
তবে তো মেডিক্যালটা
পড়বে কোলকাতাতে।।

যদি হও ইঞ্জিনীয়ার
সেটাতেও আপত্তি নাই।
তবে চাই যাদবপুরে,
কিংবা শিবপুরটাই।।

আই আই টি পেয়ে গেলে
তখন আর ধরবেটা কে।
কানপুর আর খড়্গপুর
দুটোরই বাজার আছে।।

এখুনি প্রতিজ্ঞা নাও
এখুনি শপথ করো।
আই আই টি আর জয়েন্টে
যেন ভালো র‍্যাঙ্কটা করো।।

ইউ এস এ থাকবো তখন
আমরাও ছাড়বো এ দেশ।
সেদিনই পূরণ হবে
আজকের এই বিদ্বেষ।।

জেলাতে ফাস্ট হয়েছো
সবে চায় মিষ্টি খেতে।
ওরা সব শত্রু আমার
হাসছে চিমটি কেটে।।

দিয়েছি কষে ঝাড়ন
চারিদিকে শত্রুপুরী।
নেই কোনো হাই অ্যাম্বিশন
মানুষ না ছাগল-ভেড়ি।।

এটা কী রেজাল্ট হোলো
মিষ্টি খাওয়ার মতো ?
যত সব হ্যাংলাগুলো
ছ্যাঁচড়া চ্যাংড়া যত।।

বাড়িতেই মিষ্টি বারণ
মিষ্টি কি নামবে গলায়।
বাবুরা মিষ্টি খাবেন
ছাই খা পোড়া নোলায়।।

ক্ষত
সুনীত দত্ত

নির্বাক...
দাঁড়িয়ে আছে গাছ
ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে
পাতা খসার শব্দ

এক দুই তিন
গুনতে গুনতে এক সময় ভুল হয়
ভ্রম এসে বাসা বাঁধে
তবেকি ভুলে যেতে হবে!
সন্তান সন্ততি পাঁজরের গান ?

ধীরে শ্বাস ঘন হয়ে আসে

হে কাল —
তুমি হৃদয় বোঝ না

প্রিয়র জন্মদিনে
সোনাই ভট্টাচার্য্য

আমার নির্বাক চোখের কাজল হয়ে থেকো,
বুকের পশমে নরম আদরখানি উষ্ণ রেখো...
সাতাশ বসন্ত নদী পাড়,
দেখা হবে শেষে
আবার সাতাত্তরের শরতের এক গোধূলীর দেশে...
গানে কবিতায় ছন্দে রন্ধ্রে হৃদকমলে আমায় রেখো...
বাকিসব উড়িয়ে দিও খোলা আকাশে,
কিংবা ভাসিও গাঙের বেশে...
শ্রাবণের একফোঁটা বারিকণায় যে মন নব পল্লবের মতো সজীব,
সন্ধ্যে বেলার স্নিগ্ধ প্রদীপের আলোকে আঁচল দিয়ে রাখব ঢেকে।।

গল্প

ও

কথা

এখানকার ভাষা

রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বুঝলে গো শহরের বাবু, আমাদের গাঁইয়া কথাশুনে হেসো না, আমাদের 'গেঁয়োভূত' বোলো না। বরং আমাদের এই গ্রামীণ ভাষা ও সংস্কৃতিতে একটু ডুব দিতে চেষ্টা করো। দেখছো না, স্কুলে-কলেজে-য়ুনিভার্সিটিতে-খবরের কাগজ-সিনেমায়-টিভিতে কত মাথা কত কি নতুন নতুন তথ্য ও বিনোদনের সামগ্রী সকলের সামনে তুলে ধরছে। ওই যে 'বাহা', 'আমন' থেকে শুরু করে টুসু পরব, ভাদু পরব, গাজন, মনসার ঝাঁপান, ডাক পুজা, হুল উৎসব, করম পুজা কত কি যে যার নতুন মহিমায় আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরছে। 'জঙ্গল মহল' তো স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নতুন করে আবার চিহ্নিত হয়েছে। সবাই বুঝতে পেরেছে—

''মরে না মরে না কভু সত্য যাহা
শতশতাব্দীর বিস্মৃতির তলে—
নাহি মরে উপেক্ষায়, আঘাতে না টলে।''

কথাগুলো বলার কারণ অন্য কিছু নয়, গেঁয়ো ভাষা শুনে অনেক পণ্ডিতম্মন্য মানুষ নাক সিটকায়, উপহাস করে আবার অবমূল্যায়ণ করে। সভ্যতার আলোয় ওই ভাষাকে ফেলে তাকে অসভ্য, বর্বর ভাষা আখ্যায় ভূষিত করে, Slang language বলতেও পিছপা হয় না। এদের উদ্দেশ্যেই বলি দু'চার কথা।

শুনেছেন তো, জঙ্গলবাসীদের মুখে মুখে 'মাইসর' মাসের নাম। গভীরতা আছে, এতটুকু পলকা নয়, মোটেই হালকা নয়। পুরোহিতরা সংকল্প মন্ত্রে 'অগ্রহায়ণ' শব্দটা উচ্চারণ করেন না, করেন — 'মার্গশীর্ষে মাসি'। কেন করেন ? আমাদের বাংলা মাসগুলোর নামকরণ হয়েছে এক একটা নক্ষত্র ধরে। যেমন বিশাখা নক্ষত্র থেকে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা থেকে জ্যৈষ্ঠ, পূর্বাষাঢ়া থেকে আষাঢ়, শ্রবণা থেকে শ্রাবণ, ভদ্রা থেকে ভাদ্র, অশ্বিনী থেকে আশ্বিন, কৃত্তিকা থেকে কার্ত্তিক, পুষা, মঘা, ফাল্গুনী ও চিত্রা থেকে যথাক্রমে পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র। তাহলে অগ্রহায়ণ কোথায় গেল ? 'হায়ণ' মানে বছর 'অগ্র' মানে আগে। বহু আগে অগ্রহায়ণই ছিল বছরের সব থেকে আগে, বৈশাখ নয়। তাই অগ্রহায়ণ মাস কোনো নক্ষত্র থেকে আসেনি। আর এই মাসটির নাম ছিল 'মার্গশীর্ষ' ('গীতা'-র দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। নামটি এসেছে মৃগশিরা নক্ষত্র থেকে। তাই মন্ত্রে ঠাঁই পেয়েছে 'মার্গশীর্ষে মাসি' . . .। আর এই মার্গশীর্ষ শব্দটাই মৌখিক ভাষায় 'মাইসর' হয়ে গেছে। তাহলে গভীরে ডুব দিলে মাইসর মাসের নাম শুনে হেসে ওঠা যাবে না, যা-তা মন্তব্যও করা যাবে না।

'সিনান' শব্দটাও কিন্তু হাসির খোরাক নয়— এসেছে 'স্নান' থেকে; রবীন্দ্রনাথও বলেছেন— 'সাগর জলে সিনান করি' . . . তাহলে যখন কেউ বলে 'শিনাতে যাব' বা 'লাইব' তখন ভাবতে হবে— ডুবতে হবে গভীরে। লাইব < নাইব < নাহিব . . . হিন্দিভাষীরাও বলেন 'নহানে কে লিয়ে' ইত্যাদি।

এগুলো শুনে মেনে নিয়েও গতকাল একজন বলে উঠল – 'আচ্ছা সব মানলাম, কিন্তু 'সর‍্যাও' শব্দের কী ব্যাখ্যা দেবেন ?'— আছে, আছে, একটু বাংলা সন্ধি ভেঙে দেখতে হবে— সোরে + আও < সোরে + য়াও। শব্দটাকে ব্যবহার করতে করতে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ভাবুন।

'তিড়কে উঠল' কথাটার মানে চমকে উঠল। তা, ওই 'তিড়কে' শব্দটা তাড়াতাড়ি আর তড়িতের প্রভাবে তৈরি হয়েছে। এখানেই শব্দ বিজ্ঞানের আলোচনা বেড়েছে।

'বাখান' কথাটায় হাসি পাচ্ছে, অথচ 'গালি-গালাজ', 'পচাল পাড়া' কথাগুলো সভ্যকথা! কিন্তু গভীরে গেলে 'বাখান' শব্দটি 'ব্যাখ্যা' শব্দের ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। 'আমার কথার মর্ম করুন বাখান'– কবি-লড়াইয়ের এই 'বাখান' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলা। তাহলেই ভাবুন, ভাবুন, ভাবুন, হাসবেন না মোটেই।

জঙ্গলমহল থেকে অনেক প্রবচনও মূল স্রোতে চলে যাবার দাবি রাখে। যেমন, ''মূলে মা রাঁধেনি, সাজনা আমানি''। অর্থাৎ— মা মোটেই রান্না করেনি, অথচ ছেলে বলছে— আজ কী খাব, সাজ (টাট্‌কা) না আমানি (বাসি) ?

শব্দ বা ভাষার বিকাশে ছন্দও বেশ প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন,

আঁওড়ি, চাঁওড়ি, বাঁওড়ি, মকর
এখান, ঘেঘান, সাঁই, সুঁই—
তারপর দিনে আসবি তুই

আঁওড়ি = ২৬শে পৌষ, চাঁওড়ি = ২৭শে পৌষ, বাঁওড়ি = ২৮শে পৌষ, মকর = ২৯শে পৌষ / পৌষ সংক্রান্তি। দেখান = ১লা মাঘ, ঘেঘাল = ২রা মাঘ, সাঁই ও সুঁই = ৩রা ও ৪ঠা।

এখনকার TV Serial-এ একজনের তিনটা চারটা বিয়ে দেখাচ্ছে, আর 'বারোভাতারি' বললেই হাসি পায়, এ কেমন কথা ?

তবে শুনুন, যে ইংরেজ রাজত্বে সূর্য অস্ত যায়নি, যে ইংরেজী ভাষা আজ International language, সেই ইংরেজদের তোষামোদ করতে বা ইংরেজী ভাষায় কথা বলতে লজ্জা পায় না, বরং গর্ববোধ হয়, অথচ গভীরে গেলে দেখা যাবে ইংরেজী ভাষাটা এসেছে Angles, Saxons, Jutes প্রভৃতি বর্বর জাতিদের ভাষা থেকে। আর তারপর ইংরেজরা যে দেশে গেছে সেখানকার ভাষা থেকে ধার (Loan) করতে করতে নিজেদের ভাষাটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ইমারত গড়ে নিয়েছে। ছাগল যেমন কী না খায়, ইংরেজী ভাষাটাও তেমনি ছাগলের মতোই Omnivorous অর্থাৎ সর্বগ্রাসী। আসলে ইংরেজ সারা পৃথিবী জুড়ে গ্রাস করতেই ভালোবাসতো, আর তাদের ভাষাটাই বা যাবে কোথায় ? না, এটা আমার মন্তব্য নয়, ভাষাবিদ্ Jesperson বলেছেন ''Loan words are called the milestones of English Philology''। কাজেই 'জংলি' বা 'গেঁয়ো' ভাষা— এমন মন্তব্য শুনতে ভালো লাগে না কেননা সেটা অল্পবিদ্যার ভয়ঙ্কর প্রকাশ।

হাসবেন না, অবাক হবেনা, চমকে উঠবেন না। একটা আধটা উদাহরণ নিয়ে ইংরেজি ভাষার নির্মিতিটাকে বুঝতে চেষ্টা করা ভালো। মটর কড়াইয়ের ইংরেজি শব্দ 'Pea', এটা কেমনভাবে এসেছে দেখুন। প্রথমে ছিল 'Pese', উচ্চারণ পিঝ্; উচ্চারণ করতে করতে বানানটা হয়ে গেল Pease; পরে ভাবা হলো 'e' টা না লিখলেও পিঝ্ উচ্চারণই হচ্ছে, অতএব 'e' টা বাদ যাক। গেল। এবার ভাবনা এল Peas-এর 's' টা Plural চিহ্নিত করছে, Singular টা হবে 'Pea'। এইভাবে মটর কড়াই গড়াতে গড়াতে Pea হয়ে গেল। এগুলো কি হাস্যকর নয় ? ইংরেজী ভাষা তো! আসলে – গিন্নি হাঁড়ি ভাঙলে খোলা হয়' বা 'কর্তার বাতকম্মের গন্ধ নেই'।

প্রসঙ্গত, বলাই যেতে পারে — ইংরেজরা ওদের বাবা-মা (Father-mother) পেয়েছে আমাদের আর্য ভাষা থেকেই :-

সংস্কৃত	ল্যাটিন	ইংরেজী
পিতৃ	পতের	ফাদার
মাতৃ	মতের	মাদার

তা আন্তর্জাতিক ভাষা সব ভাষার ধার নিয়ে তাদের সাথে কুটুম্বিতা করে করে সংসারটাকে মস্ত বড় করে নিয়েছে।

বাংলা ভাষায় যেমন রাঢ়ী, বারেন্দ্রী, কামরূপী, ঝাড়খণ্ডী প্রভৃতি নানা প্রভাব রয়েছে তেমনি গভীরভাবে ভাবলে, আমাদের জঙ্গলমহলের মৌখিক ভাষারও কম অবদান নেই। আর এই অবদানকে উড়িয়েও দেওয়া যাবে না, মূল স্রোত থেকে বিযুক্ত করে ভাবাও যাবে না। ভাবতে হবে। গভীরে গিয়ে ভাবতে হবে।

দনুজদলনীর দনুজ যখন দেবতা

ড. সুব্রত মুখোপাধ্যায়

বলা হয়ে থাকে সমতলের দুর্গোৎসব আর সীমান্ত বাংলার মকর পরব জাঁকের দিক থেকে প্রায় সমতুল। মকর বা টুসু পরব আদিবাসী ও মূলবাসীদের শ্রেষ্ঠ পার্বণ। খানাপিনা, নৃত্যগীত, গ্রামদেবতার পূজা মকর মেলা সব মিলিয়ে লোক ও আদিবাসী সংস্কৃতির স্বচ্ছন্দ বিহার। তা বলে এই আনন্দযজ্ঞে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার প্রতিমা পূজা এক বিরল দৃষ্টান্ত। সেই দুর্গার অকাল বোধনের খোঁজে এবার গন্তব্য সুদূর জঙ্গলে ঘেরা সুবর্ণরেখার তটবর্তী রামচন্দ্রপুর গ্রামে। ঐ গ্রামের অদূরে গভীর বনমধ্যে তপোবন। জনশ্রুতি এখানে অজ্ঞাতবাসে এসে কিছুকাল রাম-লক্ষণ-সীতা অবস্থান করেন। এখনও এখানে বাল্মীকিমুনির প্রজ্বলমান ধুনি, সীতা নালা ও লব-কুশ মন্দির রয়েছে। রসিকমঙ্গলে (১৬৬০) এর উল্লেখ আছে। যদিও বিষয়টি বিতর্কিত ও কষ্টকল্পিত। সেই থেকে গ্রামটির নামকরণ রামচন্দ্রপুর হতে পারে। নয়াগ্রাম ব্লকের বড়খাঁকরি গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত গ্রামটিতে ১২০ জন মানুষের বাস - যার সিংহভাগই বাগদি। উত্তরে প্রবহমান সুবর্ণরেখা অতলান্ত কালো জল– মহিষাসুর দহ বর্ষায় বিধ্বংসী রূপ নিয়ে পাড় ভাঙে। গ্রামের দক্ষিণে গভীর জঙ্গলে হাতিঠাকুরদের নিত্য আনাগোনা। মাঝে কালো পিচ ঢালা রামেশ্বর— নয়াগ্রাম সড়ক তার পাশে মহিষাসুর স্থান (স্থানীয়ভাবে থান) চারিদিকে গাছগাছালি ঘেরা সেখানেই প্লাস্টার অব প্যারিসে বা সিমেন্টে গড়া প্রায় ৪ ফুট এর স্থায়ী ত্রিশূলবিদ্ধ মহিষাসুর দেবী দুর্গাসহ সাথে দুপাশে জয়া-বিজয়া। দুর্গা রক্তবর্ণা, মহিষাসুর কালো রঙের। লক্ষণীয় দুর্গা পরিবারের অন্য কোন সদস্য (লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্ত্তিক, শিব প্রভৃতি) নেই। দেবীর পার্শ্বদেবতা হিসাবে চতুর্দিকে পোড়ামাটির হাতিঘোড়ার ছলনে রয়েছে কালাপাহাড়, বীরবাঁকুড়া, ভৈরব, শীতলা ইত্যাদি দেবদেবী। ২রা মাঘ ও ৩রা মাঘ দেবী দুর্গাসহ মহিষাসুরের গ্রামগত পূজা ও উৎসব, ২ দিনের মেলা যাত্রা বাউল গান, দেহরি (পুজক) শ্রী ভজহরি রাউৎ (বাগদি) লোকায়েত নিয়মে পুজাপার্বণ করেন। পাঁঠাবলিও দেওয়া হয়। লক্ষ্যণীয় এখানে দুর্গার থেকে মহিষাসুর জনপ্রিয়। মাঘ মাস ছাড়াও দুর্গোৎসবের সময়েও স্থান পুজা হয়, তবে স্থানীয়দের কাছে মাঘের পূজাই বড় পূজা ও গ্রামীণ উৎসব। কিন্তু কেন এই উল্ট পুরাণ ?

অনুসন্ধানে জানা গেল বর্তমান রাস্তার পাশে দুর্গা-মহিষাসুর মূর্তিসহ স্থায়ী স্থানটির বয়স মাত্র ৮ বছর। আসল মহীষাসুর থান রয়েছে সুবর্ণরেখার তীরে। জনাকয়েক গ্রামবাসীসহ চড়াই উৎরাই ২ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে আদিস্থানে পৌঁছানো গেল। সেখানে সুবর্ণরেখা গভীর, নিস্তরঙ্গ কালো জলে ভরা। এই অংশে একাধিক গভীরতম জায়গা (স্থানীয়ভাবে দহ) রয়েছে যেখানে মহিষাসুর দহ, মাষাড় দহ, পাতিনা দহ, মেড়িয়া দহ প্রভৃতি। একদা নদতটে দক্ষিণে গভীর অরণ্যে আবৃত ছিল। জনশ্রুতি, সুবর্ণরেখার এই অংশে কখনও জাহাজ ডুবে গেছিল যার জন্য নদীর উত্তরে এখনও জাহাজডোবা বলে স্থান রয়েছে আর দক্ষিণে জঙ্গলের নাম জাহাজকানা জঙ্গল। শ্রদ্ধেয় আনন্দ পুরস্কার ২০১৯ প্রাপ্ত সাহিত্যিক নলিনী বেরা মহাশয় এখানকার ভূমিপুত্র। তাঁর গল্পে (শারদীয়া মেঠোপথ) বিষয়টির উল্লেখ আছে।

ঈদৃশ পরিমণ্ডলে ক্ষেত্রসমীক্ষায় আদি মহিষাসুর স্থানে দেখা গেল অবিন্যস্ত পোড়ামাটির হাতিঘোড়ার ছলনে প্রতীকী মহিষাসুর ও ভগবতী (দুর্গা) উপস্থিত। ক্ষীণকায় দেহরি জ্ঞান ভক্তা জানালেন এই আদি স্থানটি বড়ডাঙ্গা, রামচন্দ্রপুর এবং বাইশবটিয়া গ্রামের। একদা এখানে ধূমধাম সহকারে মহিষাসুর ও দুর্গার পুজা হতো। ছিল পাথরের মূর্তি কিন্তু নদীর করালগ্রাসে এখানকার জনপদ ও স্থান তলিয়ে যায়। বর্তমানে যা আছে কয়েকবছর পর সেটাও আর থাকবে না। তাই রামচন্দ্রপুরের অধিবাসীরা উঁচুজায়গায় রাস্তার পাশে পৃথক স্থান গড়ে, দেহরি দিয়ে মূর্তি বানিয়ে পুজো করছে। আর নদীপারের দেহরি তার মত জীর্ণবসন শীর্ণতনু নিয়ে স্থান আগলে রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল কে এই মহিষাসুর ? এ কী স্বর্গরাজ্যে

দেবতা বিতাড়নকারী অসুর ?

উত্তরবঙ্গে নাগরাকাটা অঞ্চলে অসুর জাতি গোষ্ঠীর লোকজন বাস করে, যারা দুর্গোৎসবের সময় মহিষাসুর পুজো করে। সম্প্রতি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনী কঁদাশোল গ্রামে আদিবাসীরা মূর্তি বানিয়ে মহিষাসুর পুজা করছে। সাঁওতালী লোককথায় তাদের বীর হুদুড়দুর্গাকে কোন লাস্যময়ী দেবী বিজয়ার দিন অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করার কাহিনি প্রচলিত। সেই সূত্রে বিজয়ার দিন ঐ উপজাতির জনগোষ্ঠী ভূয়াং বা দাঁশায় নাচের মাধ্যমে শোকপালন করে। উল্লেখিত সুবর্ণরৈখিক এলাকার অর্থকারী ফসল হল আর বা ইক্ষু। নদীর দুপাশে দিগন্ত বিস্তৃত ইক্ষুক্ষেত। মাঠের আখমাড়াই এবং গুড় প্রস্তুতি পর্বে যে দেবতার পুজা আবশ্যিক সে হল পঁড়াসুর। কাদামাটি দিয়ে গুড় প্রস্তুতের 'ডেগ' এর (গুড় তৈরির বড় পাত্র বিশেষ) মাথায় একটি মনুষ্য অবয়ব নির্মাণ করা হয়। পুজোর জন্য লাগে খই-মুড়কি, ঘইস ফুল, বেলপাতা। ইনিই পঁড়াসুর। সুবর্ণরৈখিক ভাষায় 'পঁড়া' শব্দের অর্থ পুরুষ মোষ, তাই ইনি মোষের অসুর অর্থাৎ মহিষাসুর। তবে এখানে তার যুদ্ধমত্ত হুঙ্কার নেই। রামচন্দ্রপুরের মহিষাসুরও ভক্ত বৎসল। মহিষাসুর দঁক (দহ) এর পাড়ে এর আদিস্থান। গ্রামবাসী নন্দনায়েক বললেন, ''গো-মহিষাদি রক্ষা ও রোগ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণের জন্য আমরা মহিষাসুরকে পুজো দিই। উনি বড় জাগ্রত দেবতা।''

প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে নয়াগ্রাম-এর উল্লেখিত ভূখণ্ডে মহিষাসুর গ্রাম দেবতা। স্বাভাবিকভাবে দুর্গা ছাড়া মহিষাসুরের কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। তাই বোধহয় রামচন্দ্রপুরে স্থানে দেবী দুর্গার স্থায়ী অনুপম মূর্তি। মহিষাসুর ত্রিশূলবিদ্ধ। পূজারী অব্রাহ্মণ বাগদি কুলোৎপন্ন। দুর্গা থাকলেও তাঁর পরিবারের সদস্যরা অনুপস্থিত। ২রা মাঘ ২ দিনের গ্রামগত 'বড়পুজা'। দুর্গোৎসবকালীন ভক্তদের মানতে দুর্গা ও মহিষাসুরের পুজা হয়। কোন শাস্ত্রীয় রীতিনীতি ছাড়াই। ক্ষেত্রের পার্শ্বদেবতারা মনুনিষিদ্ধ একদল গ্রামদেবতা। যতদূর জানা যায় মূল বাল্মীকি রামায়ণে রাবণ সংহারের জন্য শরৎকালে দুর্গাদেবীর অকালবোধনের কাহিনি নেই। পরবর্তীতে কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেবী বাসন্তীর পরিবর্তে শারদীয়া হলেন। কিন্তু মাঘের শীতে মূলবাসীদের মহিষাসুরমর্দিনীর বড়পুজা এক লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন কিনা বিতর্কিত। তবে ভয় ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসার মিশ্রণে মানুষ দেবতার সৃষ্টি করেছে তা জোর দিয়ে বলা যায়। আর সেই অর্থে দৈত্যরাজ মহিষাসুর এখানে ভক্ত বৎসল দুর্গতিনাশিনী দুর্গার পদতলে বঙ্গের দুর্গা সংস্কৃতির ভিন্নরূপে।

নদী জীবন ও মেলা

হরিশঙ্কর দে

'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থে আচার্য নীহার রঞ্জন রায় লিখেছেন ''বাংলার ইতিহাস রচনা করেছে বাংলার ছোট বড় অসংখ্য নদ-নদী। এই নদীগুলোই বাংলার প্রাণ। এরাই যুগে যুগে বাংলাকে গড়েছে। বাংলার আকৃতি প্রকৃতি নির্ণয় করেছে।'' ঠিক তেমনই পুরুলিয়ায় উৎপন্ন ও প্রবাহিত নদীগুলি শুধু পুরুলিয়া নয়, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলাগুলির আকৃতি, প্রকৃতি পরিবর্তন করে চলেছে। জেলা গুলির প্রাচীন ইতিহাস বুকে ধরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, দুই তীর ভরে দিয়েছে সবুজ দিগন্তে। মানব জীবনের প্রাত্যহিক জীবিকা বর্তমান কাল পর্যন্ত নির্ণয় করে চলেছে — তা কৃষিভিত্তিক হোক বা শিল্প ভিত্তিক।

পুরুলিয়া জেলা গঠিত হওয়ার ইতিহাস সু-প্রাচীন। সেই ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছে পুরুলিয়ার নদ-নদীগুলি। তবে সাধারণ মানুষের চোখে পুরুলিয়া জেলা শুষ্ক, রুক্ষ হলেও সেখানের প্রকৃতি অকৃপণ। প্রকৃতি সেজে উঠেছে যেন কোনো অদেখা শিল্পীর তুলির আঁচড়ে বা টানে। পুরুলিয়া জেলা কঠিন পাথরে মোড়া হলেও নদীনালার সংখ্যা খুব একটা কম নয়। জেলার প্রধান নদীর সংখ্যা সাতটি — দামোদর, কংসাবতী, সুবর্ণরেখা, কুমারী, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী এবং টটকো।

বড় নদী ছাড়াও ২০-২১ টি ছোট নদীও রয়েছে। কে বলে পাথরের বুক বেয়ে জল গড়ে না ? তার প্রমাণ সুপ্রাচীন কাল থেকে দিয়ে আসছে শুষ্ক, রুক্ষ, জঙ্গলময়, পাথরময় পুরুলিয়ার নদী ও নালাগুলি। প্রতিটি নদী সমতল ভূমিতে নেমে এসে কত মাটির বুকে এঁকে দিয়েছে সবুজ প্রান্তর।

এরপর আলোচিত হবে কিছু নদীর প্রবাহপথ ও সেই নদীকেন্দ্রীক কিছু মেলা যা প্রাচীন কাল থেকে আজও প্রবহমান —

১। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে বালিযাত্রা মেলা
২। শিলাবতী নদীর জন্মদিন উপলক্ষে পৌষ সংক্রান্তির মেলা
৩। দ্বারকেশ্বর নদীর চরে মুড়ি মেলা
৪। কুমারী নদীর ভাদুর মেলা
৫। কংসাবতীর মুকুটমণিপুর ও বড়কলার কুস্তি মেলা।

১। সুবর্ণরেখা নদীটি রাঁচির (ঝাড়খণ্ড) কাছে হুড্রু জলপ্রপাত থেকে উৎপন্ন হয়ে সিংভূম, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তালসারিতে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। নদীর মোট দৈর্ঘ্য ৩৯৫ কিলোমিটার। এই নদীর বালুচরে অনেক সময় স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। সেই কারণে নদীটিকে সুবর্ণরেখা বলা হয়। অসংখ্য জাতি, উপজাতির মানুষ বসবাস করে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে। বালি ছেঁকে সোনা সংগ্রহ, মাছ আহরণ তাঁদের উপজীবিকা। বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র হুড্রু জলপ্রপাত ছাড়াও তামার খনি, স্বাস্থ্কর নিবাসের জন্য ঘাটশিলা অঞ্চল — এগুলি সুবর্ণরেখার তীরেই অবস্তিত। সুবর্ণরেখার তীর ঘেঁসে আরও রয়েছে গ্রামীণ ও আদিবাসী জনপদের অকৃত্রিম বহু বিচিত্র সংস্কৃতি।

পান্ডবদের পিতৃতর্পণের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে বালিযাত্রা মেলা। বালিযাত্রা মেলা শুধু সুবর্ণরেখা নদীর তীরেই অনুষ্ঠিত হয়। সুবর্ণরেখা নদীর পশ্চিমে যেখানে নদীটি ঝাড়খণ্ড থেকে বাংলায় ঢুকেছে সেখানে করবনিয়া গ্রামের কাছে মূল বালিযাত্রা মেলাটি বসে। কিন্তু সুবর্ণরেখা নদী পূর্বে যেখানে বাংলা থেকে উড়িষ্যায় ঢুকেছে সেই সব স্থান থেকে ৬০-৬২ কিলোমিটার দূরে করবনিয়ার মূল বালিযাত্রার স্থানে সকলে আসতে পারে না বলে নদীর তীরে নানা স্থানে ছোট ছোট বালিযাত্রা মেলা বসে। দাঁতনের পরতপুর, সোনাকানিয়া এবং বেলমূলাতে, কেশিয়াড়ির ভসরাঘাটে এবং উড়িষ্যার জলেশ্বরের রাজঘাট ও মাকড়িয়ার সুবর্ণরেখা নদীর তীরে চৈত্র সংক্রান্তির দিনেই বালিযাত্রা মেলা বসে।

মেলাটির উপকরণ খুব সাধারণ, ছাতু। সেটাই উৎসর্গ করা হয় পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে। দলে দলে লোক এসে উপস্থিত হন সুবর্ণরেখার তীরে। পিতৃপুরুষকে স্মরণের এই রীতি উপলক্ষে নদীর তীরে বসে মেলাটি। রীতিপালন এবং মেলা মিলে গোটা বিষয়টি ছাতু সংক্রান্তির মেলা নামে পরিচিত। কিন্তু এই রীতি বালিযাত্রা নামেই পরিচিত।

বালিযাত্রার অন্য এক তাৎপর্য রয়েছে, এর সঙ্গে মহাভারতের যোগ রয়েছে বলে লোক প্রচলিত বিশ্বাস। মনে করা হয় অজ্ঞাতবাসের শেষে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে যুধিষ্ঠির বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধের ইচ্ছে প্রকাশ করেন। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন উত্তরবাহিনী গঙ্গা। তিনি তখন সুবর্ণরেখার অববাহিকা অঞ্চলে বসবাস করেন। সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন অর্জুন। তিনি তীর ছুঁড়লেন মাটিতে। মাটির নীচ থেকে মন্দাকিনীর ধারা এসে মিলিত হল সুবর্ণরেখায়। সুবর্ণরেখা হয়ে গেল উত্তর বাহিনী গঙ্গা। যুধিষ্ঠীর নদীর তীরে বালিচরে বসে ছাতু দিয়ে পিতৃশ্রাদ্ধ করলেন। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমানায় করবনিয়া গ্রামের কাছে আজও এই অঞ্চলে সুবর্ণরেখার উভয় তীরে পাণ্ডবদের পিতৃশ্রাদ্ধের স্মরণে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে অনুষ্ঠিত হয় বালিযাত্রা মেলা।

বালি যাত্রাকে স্থানীয় ভাষায় বলে 'বালিযাত'। সুবর্ণরৈখিক ভাষায় 'যাত' মানে মেলা। বালির উপরে অনুষ্ঠিত মেলা বা যাত হল 'বালিযাত'। এই 'বালিযাত'-ই বিশিষ্ট প্রয়োগে 'বালিযাত্রা'। মনে করা যেতে পারে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে যুধিষ্ঠীর সুবর্ণরেখা নদীর তীরে বালির উপরে যাত্রা বা গমন করেছিলেন বলেই বালিযাত্রা।

নদীকে দেবীরূপে পূজা ভারতীয় সংস্কৃতির এক অভিন্ন অংশ। নদীমাতৃক দেশে আমরা বিভিন্ন নদীকে বিভিন্ন রূপে পূজা করি। ভসরাঘাটের কাছে সুবর্ণরেখার দুই তীরের মানুষ নদীকে পূজা করেন। ডাহির মানুষ সাঁতাই বুড়ি রূপে আর আটাঙ্গার মানুষ রুকনা বুড়ি রূপে পূজা করেন।

২। শিলাবতী নদীর জন্মদিন উপলক্ষে পৌষ সংক্রান্তির মেলা শিলাবতী নদীর জন্মদিন রয়েছে মনে করেন পুরুলিয়া জেলার মানুষজন। প্রতিবছর পৌষ সংক্রান্তির দিনে মেলা বসে হুড়ার বড়গ্রামের কাছে, শিলাবতী নদীর উৎসস্থলে। তিন দিনের মেলা হয় তবে ভাঙা মেলা রয়ে যায় প্রায় সপ্তাহ খানেক। পুরুলিয়ার সীমানা পার করে শিলাবতী চলে গেছে বাঁকুড়া হয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরে। পুঞ্চা-পুরুলিয়া রাস্তার বড়গ্রাম গ্রামের কাছে একটি কালভার্ট রয়েছে, সেখান থেকে নদীর উৎস বলে মনে করা হয়। স্থানীয় মানুষ জনের বিশ্বাস নদী পরিবারেরই মেয়ে। প্রাচীন প্রবাদ রয়েছে — এখানে একটি আশ্রমে এক সময়ে এক সাধু বসবাস করতেন। স্থানীয় এক মহিলা তাঁর টুকিটাকি কাজ করে দিতেন। সাধু তীর্থে যাবেন, সেই মহিলা তাঁর হাতে একটি পুটলি তুলে দিলেন, অনুরোধ করলেন, গঙ্গায় যেন ছুঁড়ে ফেলে দেন।

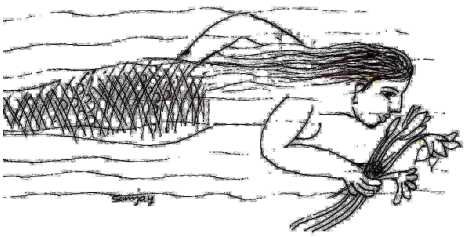

কথিত আছে সাধু যখন সেই পুঁটলি ছুঁড়লেন দেখলেন নদী থেকে উঠে এল দুটি হাত। পুঁটলি নিয়ে আবার ডুবে গেল। এক রাশ বিস্ময় নিয়ে গ্রামে ফিরলেন তিনি। দেখলেন দূর থেকে সেই মহিলা কাঁখে কলসী নিয়ে জল নিয়ে আসছেন। সাধু ডাকতেই দৌড়তে শুরু করে দেন তিনি। হঠাৎ কলসি পড়ে যায় কোমর থেকে, গড়িয়ে গেল জল। অদৃশ্য হয়ে গেলেন সেই মহিলা। জনশ্রুতি হল, সেই কলসির জল থেকেই জন্ম নেয় শিলাবতী নদী। এই প্রবাদ ঘিরে প্রতিবছর নদীর পাশে জমে ওঠে জন্মদিনের মেলা। পুজো হয় শিলাবতীর মন্দিরে। শিলাবতী মন্দিরের পিছনে পুকুরে নৌ চালানো হয়। থাকে নাগরদোলা, হরেক রকমের দোকান। মন্দিরে এসে অনেকে শিলাবতীর মাটির মূর্তি নিয়ে যান।

৩। দ্বারকেশ্বর বা ঢলকিশোর বা ধলকিশোর দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমবঙ্গের একটি অন্যতম নদ। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, হুগলি ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উপর দিয়ে এ নদী প্রবাহিত। পুরলিয়া জেলার কাশীপুর থানার আদ্রা শহর ও হুড়া গ্রামের মাঝখানে অবস্থিত একটি ঝিল থেকে উৎপন্ন হয়ে দ্বারকেশ্বর নদ পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের কাছে শিলাই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে দ্বারকেশ্বর রূপনারায়ণ নামে প্রবাহিত হয়েছে।

সঞ্জীবনী লাভের আশায় বাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়ায় সঞ্জীবনী মেলায় হাজির হন হাজার হাজার মানুষ। মুড়িকে কেন্দ্র করে যে, মেলা বসতে পারে তা কল্পনারও অতীত। অথচ বছরের পর বছর ধরে এই মুড়ি মেলা হচ্ছে বাঁকুড়া জেলার কেঞ্জাকুড়া সঞ্জীবনী মায়ের আশ্রমের কাছে দ্বারকেশ্বর নদীর চরে। মায়ের আশ্রমের কাছে দ্বারকেশ্বর নদীর চরে। স্থানীয়ভাবে প্রচলন রয়েছে — ''আমরা বাঁকুড়াবাসী / মুড়ি খাই রাশি রাশি।'' প্রতি বছর ৪ঠা মাঘ বসে এই মেলা। নদীর বালি সরিয়ে ছোট ছোট গর্ত করলে সেখানে জমে মিষ্টি এবং সুস্বাদু জল, স্থানীয় ভাষায় একে চুঁয়া বলা হয়। সেই চুঁয়া থেকে জল সংগ্রহ করে মুড়িতে মেখে চলে খাওয়া দাওয়া। বাড়ি থেকে বানিয়ে আনা হয় মুড়ি খাওয়ার নানা উপকরণ। বসে মেলাও। চলে মুড়ি খাওয়ার প্রতিযোগিতা। এভাবে সারাদিন কাটিয়ে সঞ্জীবনী মায়ের আশ্রমে নরনারায়ণ সেবার খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করে সন্ধ্যার আগেই সকলে বাড়ি ফেরেন। কথিত আছে এই মুড়ি মেলা আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে শুরু হয় বাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়ার দ্বারকেশ্বর নদীর চরে। মুড়ি খাওয়ার মেলা। শুধু বাঁকুড়া জেলা নয় পাশাপাশি অন্য জেলা থেকেও মানুষ এই মুড়ি মেলায় এসে আনন্দ উপভোগ করেন।

কথিত আছে এক সাধু কেঞ্জাকুড়া গ্রামের কাছে দ্বারকেশ্বর নদীর পাড়ে এক নিম গাছের নিচে আশ্রয় নেন। সেখানেই ধ্যানে মগ্ন হয়ে সিদ্ধিলাভ করেন। পরবর্তীকালে এই সাধুর উদ্দেশ্যেই দ্বারকেশ্বর নদীর চরে মা সঞ্জীবনী মাতার আশ্রম তৈরী হয়। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে ওই আশ্রমে নাম সংকীর্তনের আসর বসে। সেই সংকীর্তন চলে মোট পাঁচ দিন। দূর দূরান্ত থেকে নাম সংকীর্তন শুনতে অসংখ্য ভক্তের ভীড় জমায়েত হয় এই সঞ্জীবনী মাতার মন্দিরে। সারারাত ধরে চলে নাম সংকীর্তন। সকলে কীর্তন শুনে নিজেদের সঙ্গে আনা মুড়ি খেয়ে নিজের নিজের বাড়ি ফেরেন। এভাবেই বছরের পর বছর ধরে প্রাচীন রীতি মেনে হরিনাম সংকীর্তনের শেষে দ্বারকেশ্বর নদীর চরে সঞ্জীবনী মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে শুরু হয় 'মুড়িমেলা' উৎসব।

এছাড়াও কুমারী নদীর ভাদুর মেলা ও কংসাবতীর মুকুটমণিপুরের মেলা ও বড়কলার কুস্তি মেলা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। ভাদু ভাসানকে কেন্দ্র করে কুমারী নদীর দুয়ারশিনি ঘাটে বসে ভাদু মেলা। তাকে কেন্দ্র করে প্রচলিত সঙ্গীত —

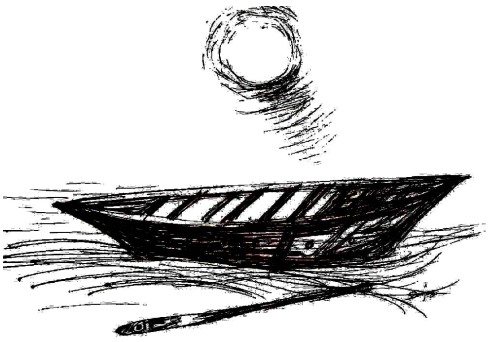

''যেও না যেও ভাদু, দাঁড়াও নদী কূলে
বছর পরে আবার এসো, যেও নাকো ভুলে
পান দেব সুপারি দেব, ওই রাঙ্গা ঠোঁটে গো
খিলখিলিয়ে হাসির ছটা, নদীর ওই জলে গো।''

এমনই বিভিন্ন সঙ্গীতে মুখরিত হয়ে ওঠে দুয়ারশিনির ঘাট। কবে থেকে ভাদু ভাসানের এই মেলা শুরু হয়েছে সে ইতিহাস অজানা। লোক সংস্কৃতির এই ধারাকে জঙ্গলমহলের বাসিন্দারাই ধরে রেখেছেন। বলা চলে মানুষের জীবন যতই ভোগবাদের পিছনে ছুটুক, এই প্রত্যন্ত

এলাকার বাসিন্দারাই লোক সংস্কৃতির ধারাকে বহন করে চলেছে। অনেকের কাছে এই উৎসব গুলোই বিনোদন। পুরুলিয়া তথা বৃহত্তর মানভূম (জঙ্গলমহল) এলাকায় কৃষিভিত্তিক এইসব লোক উৎসবগুলি প্রান্তিক বাসিন্দারাই টিকিয়ে রেখেছেন। টুসু, ভাদু, করম পুজো উপলক্ষে একেবারে নিরক্ষর লোকেরাও মুখে মুখে গান রচনা করেন। লোকে দেব-দেবীকে বাড়ির মেয়ে, মা, কখনও সখি হিসাবে কল্পনা করে লোকগান রচনা করেন। চলে গানের লড়াই। গানে গানে প্রশ্ন এবং গানেই তার জবাব মিলে —

''আমার ভাদু দেখতে সুন্দরি/
তোদের ভাদুর চোখ ট্যারা।''

এ ধরনের ব্যঙ্গাত্মক ছড়াও কাটা হয়।

কংসাবতী নদীর তীরে বৈতা আর অপর পারে বড়কলা গ্রামে মকর সংক্রান্তির দিনে এখনও প্রচলিত 'কুস্তিমেলা'।

বলা চলে এই নদীগুলি মানুষের আবেগ, উচ্ছ্বাস, অনুভূতি, ভালোবাসা, উৎসব প্রভৃতিকে বুকে নিয়ে বহন করে চলেছে। তৈরি করে চলেছে মানুষের জীবনের ইতিহাস। এখনো মানুষ তাদের কর্ম ব্যস্ততার ছুটিতে কিছুটা সময় কাটায় নদীগুলির তীরে মেলাকে কেন্দ্র করে। সময়ের সাথে সাথে এখনো তা বহমান।

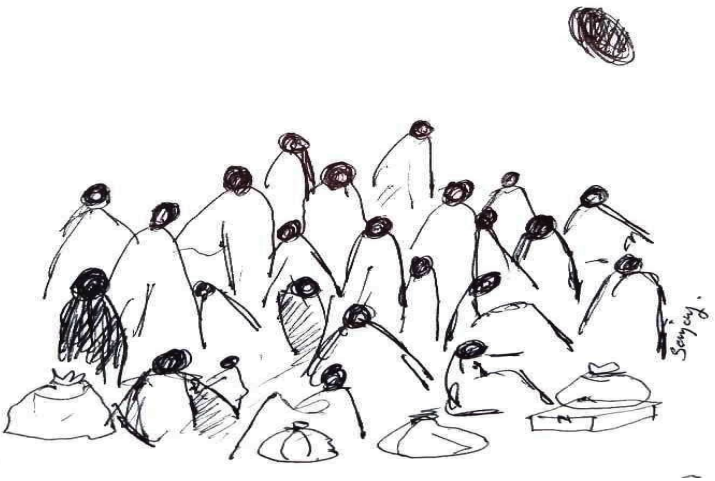

কবি অশোক মহান্তী : ''অনিরুদ্ধ নাম রাখি, অনিবার্য আমার কামনা''

প্রিয়ব্রত গোস্বামী

যতবার তাঁর বাড়ি যাই ততবার বাড়ির বারান্দায় বসে এক তীব্র আকর্ষণবোধে জাগ্রত করেছে বইয়ের ভিড়ে থাকা দেওয়ালে টাঙানো একটি অনিন্দ্যসুন্দর ছবি। সে ছবিতে পুরীর উত্তাল সমুদ্রের দৃশ্য। কিন্তু ঈশ্বরীয় আবেশে অলৌকিকতায় চিরসত্য হয়ে উঠেছে তা। সমুদ্রতীর বরাবর জলোচ্ছ্বাসে নিখুঁত দুরন্ত পা ফেলে রেখে নির্দিষ্ট গতিতে দুজনে ছুটছেন। হাস্যময় মুখ, বলিষ্ঠ চেহারায়। একজন যুবা কিশোর, আর একজন মধ্যবয়স্ক তরুণ। জীবনের অলৌকিক দৌড় দৌড়ে চলেছেন। একজন নশ্বরতায় বিলীন হয়েছেন, অন্যজন নিরুদ্দেশ টানা পনের বছর। একজনের পরিচয় কবি এবং অন্যজন কবির পরম স্নেহে প্রতিপালিত সবে ধন নীলমণি সন্তান। কবি অশোক মহান্তী ও তাঁর পুত্র অনিরুদ্ধ ওরফে কুটুর কথা বলছি, হে নিমগ্ন পাঠক। স্বাভাবিকভাবে আমাদের ধরে নিতেই হয় যে, পিতার আদর্শ পর্যায়ক্রমে ততদিনে পুত্রের মধ্যে বিলক্ষণ সঞ্চারিত। পিতার পূর্বাপর লক্ষণ পুত্রের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন বহমান। সেই আদর্শ থেকেই পুত্র পিতার কর্তব্য পালনে ঘর ছেড়ে বাহিরে প্রত্যাগমনে রত। আসলে যা হবার ছিল তাই হয়েছে। আসলে তা স্বভাব সুলভ হওয়ারই ছিল, হয়েছে। সুনির্দিষ্ট লক্ষণ অনুসারে তা কার্যতে সিদ্ধি হয়েছে অর্থাৎ কিনা বিধিবদ্ধরূপ ফলেছে এবং এক্ষেত্রে অস্বাভাবিক কিছু নয়, যা মনে হয়েছে স্বয়ং আমার। এতদিনে কুটুর বয়স তেত্রিশ বড় জোর চৌত্রিশ ঠেসেছে। পূর্বাপর সংলক্ষণ মেনে সেও হয়তো পিতার কার্যধারার নিয়ন্ত্রিত। তাঁর চিঠির বয়ান কিছু তুলে ধরেছি এ অনুষঙ্গে — 'মা, বাইরের ডাক এসেছিল। সেই ভালবাসার জনের। যে জন দেয় না দেখা। আর থাকতে পারলাম না। একটা কিছু করার দরকার আছে। জানিনা তোমার খুব কষ্ট হবে। কিন্তু কিছু করার নেই যে। আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' এ চিঠি পড়ে আশ্চর্য হতে হয়, হতচকিত হতে হয়। আশ্চর্য হবারই যে। হলে অস্বাভাবিক আশ্চর্যের কিম্বা স্বাভাবিক আশ্চর্যের — এই দুটোর কোনটাকে ধরব আমরা ? মা ছেলের প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছেন একলা ঘরে। ছেলে কবে ফিরবে ? — আকুল প্রার্থনায় সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছেন কবির সংসার। ধূপ-ধুনো ফুল-চন্দনে সুরভিত সে ঘর। আমাদের এ নিরুপায়ে নিষ্কৃতি নেই। স্বীকৃতি নেই সত্তরের শক্তিশালী কবির। বাইরের কবিতার জগতে যখন গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছে তখন এ কবির কবিতা তাঁর পরিচ্ছন্ন ঘর সাক্ষাৎ ঈশ্বর দর্শন। ঈশ্বর গৃহিনীর গুপ্ত সংসার। তিনি তা পরম যত্নে আগলে রেখেছেন। এরকম শুদ্ধতাই তো আমরা চেয়েছি। আমরা সে অর্থে কবির লোভনীয় ভেসে যাওয়াকে কোনোদিন মেনে নিতে পারিনি। তা পারবোও না। এই সীমায় দাঁড়িয়ে কবি অশোক মহান্তী সৎ নিষ্ঠাবান একনিষ্ঠ প্রেমিক। তাঁর কাজ থেকে তিনি কখনোই থেমে থাকেন — 'আমি কবি সাজিনি। বলতে পারেন – আমি কবি হয়েই জন্মেছি। আমি সাধু সাজিনি। বলতে পারেন — সাধুতাই আমার চরিত্রের স্বভাব। আমি প্রেমিক সাজিনি বলতে পারেন – প্রেমই আমার মজ্জাগত সংস্কার।

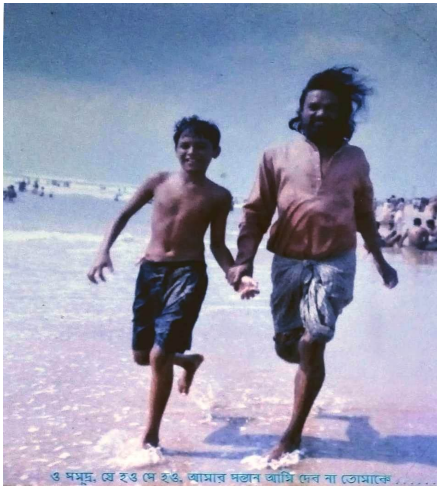

শুধু আমার মধ্যে যা মিথ্যা, যা অর্ধ সত্য, যা আত্মঘাতী / এই আটচল্লিশ বছরের জীবনে সেটুকুই আমি অর্জন করেছি অনেক চেষ্টায়। ''কবি মরে যান না – লিখতে পারার বেদনায়'' — এই তাঁর আত্মপক্ষ চিৎকার। এই চিৎকার ছড়িয়ে পড়ুক পাঠকের মর্মস্থলে

এবং পাঠক তা উপলব্ধি করুক একান্ত বিস্ময়ে।

কুটুর কথায় আসি — সন্ন্যাস যাঁর ভেতরে অবধারিত ছিল, সন্ন্যাস টেনে নিয়ে গেছে তাঁকে আবর্তনের সে পথে। সে পথে সেও পা রেখেছে তৃতীয় প্রজন্মের উত্তরাধিকার হিসেবে। যে সম্ভাবনার বীজ প্রপিতা পিতার মধ্যে জাগরিত হয়েছি, সে বীজ শেষমেশ এসে দাঁড়াল অনিরুদ্ধে। কবি অশোক মহান্তী মুখে বলতেন, যা - শোনা তাঁর স্ত্রীর মুখে আমারও যে, — 'অনিরুদ্ধ নাম রাখি / অনিবার্য তার কামনা।' সত্যই তা উজ্জীবনী শক্তি রূপে ক্রমপ্রকাশ্য হল। মা মুখিয়ে রয়েছেন ছেলের জন্য আর ছেলে যেন পিতৃসত্য পালনে দায়িত্ব হাতে নিয়ে তা এড়িয়ে যেতে পারেনি। বংশানুক্রম ক্রিয়ায় তাঁকেও হতে হয়েছে বৈরাগী। তবে আশার বাণী যে, সে ফিরে আসবে মায়ের কাছে — 'মা আমি ফিরে আসবো। অবশ্যই। প্রতীক্ষায় থেকো।' কবি পিতার কর্তব্য স্বয়ং সম্পূর্ণ হলে সে আসবে একথা চিঠিতে বারবার লিখেছে।

এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে অশোক মহান্তী এক ক্ষীরোদ সমুদ্রের নাম। প্রকৃত কবির গুণ তাঁর সাথে সাবলীলতায় বিদ্যমান হয়ে আছে এক অপূর্ব দৈববশে। আর কবিপুত্র অনিরুদ্ধে ইতিপূর্বে তা সঞ্চার হয়েছে, কেননা তার ফেলে রেখে যাওয়া চিঠিতে স্পষ্টত ছাপ ও প্রমাণের অক্ষর একবৃন্তে জড়ো হয়ে আছে। যে বয়স স্বাভাবিকভাবে উদ্দামের দুরন্তের সেই উনিশ বছর বয়সে সে তার মধ্যে পেয়েছে পরিমিতিবোধ, বাকসংযম, অকপট সরলতা ও পটুতা। এত কিছু এল কোত্থেকে ? সত্যি, অদ্ভুত এক সমন্বয় পিতা-পুত্রের। আগে থেকে শুরু হওয়া এক অটুট সম্পর্কের রসায়ন বা মিথোস্ক্রিয়া বলা যেতে পারে। আলোক-বর্ণালীর ভেতর ফতুয়া আর পাঞ্জাবিতে দাঁড়িয়ে থাকা সন্তানের ছবি সহজেই সব রহস্যের দুয়ার খুলে দেয়। যে বয়সে পরিণত সে অনেকটাই। একটার পর একটা আশ্চর্যের বাঁধ সামলানো দায়! জীবন্ত সত্যকে কখনো কেউ দমাতে পারে না। কবি অশোক মহান্তী তার জ্বলন্ত উদাহরণ। ঝাড়গ্রামের কোর্ট রোডে যিনি ব্যবসার পাশাপাশি বাংলা ভাষার শক্তিশালী স্বতন্ত্র কবি হিসেবে স্বরাট ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং কবিতার মৌলিক ধারায় তাঁর নাম সুধী পাঠকদের কাছে চিরস্থায়ী আসনে থেকে যাবে, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

কবির 'কবিতা-বিষয়ক কবিতা' শিরোনামে এক নম্বর কবিতার পুরো অংশ রেখে সম্পূর্ণ লেখাটির শেষাংশ জুড়তে চেয়েছি, যেখানে কবি অশোক মহান্তীর স্বাতন্ত্রকে আলাদাভাবে চিনিয়ে দেয় আমাদের, বলার মতো থাকে না তখন কিছুই —''

''কী যে বলবো, তার কোনো ঠিক নেই। / কী যে লিখবো, তারও কোনো ঠিক নেই। / শুধু এমন একটা অস্থিরতায় ডুবে থাকা যে / মনে হয়, কবিতা ছাড়া উঠে দাঁড়াবারও আর কোনও জায়গা নেই।/

চোখ মেললে যে আকাশ দেখতে চাই — জানি, এই আকাশ আমার নিজের। / পায়ের তলায় যে পৃথিবী দেখতে পাই প্রতিদিন — জানি, এই পৃথিবী আমার নিজের।/ স্মৃতির ভেতর যতগুলি শব্দ খুঁজে পাই — জানি, এই শব্দগুলি আমারই আত্মপ্রকাশের জন্য তৈরি।/

শুধু আমার মধ্যে যে আমি — সে-ই, প্রকৃতপক্ষে আমার আয়ত্তের মধ্যে কিনা / তাতেই ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হলে, / কবিতার মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাই / একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরেরমতো।''

পর্দার পিছনে

বিকাশ রায়

সন্ধ্যাবেলা। পড়ার ঘরে বসে আছি। সারাদিন টিভির খবর দেখে মাথাটাই ডাস্টবিনে পরিণত হয়েছে। করোনা উৎকণ্ঠার মধ্যে সবে লকডাউন আতঙ্ক থেকে বেরিয়েছি। কিন্তু পুরোপুরি আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারিনি। দীর্ঘ লকডাউন যে বদ অভ্যাসের সূচনা করে দিয়েছে, তার থেকে বেরিয়ে আসতে যে আরও বেশ কয়েক মাস লেগে যাবে এটা সম্বন্ধে আমি প্রায় নিশ্চিত।

অতীতের সৃজনশীল কর্মকাণ্ড থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছি। এটা বেশ বুঝতে পারি। আর হবে নাই বা কেন ? ডাস্টবিন থেকে আর যাই হোক না কেন ভালো চারাগাছের জন্ম হয় না, যতদিন না সেই ডাস্টবিনের ময়লা পচে সার তৈরী হচ্ছে।

চার দেওয়ালের মাঝে বন্দি থেকে থেকে জীবন বোধটাই ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে। মাথার মধ্যে একরাশ ভাবনা এলেও সেখান থেকে সুন্দর কিছু বের হচ্ছে না। আর যা আসছে তার থেকে সুগন্ধ ছড়ানোর পরিবর্তে দুর্গন্ধ ছড়ানোর সম্ভাবনাই বেশী। তাই বেশী এগেনোর সাহস পাইনা।

এই রকম সাত পাঁচ চিন্তার স্রোত রোধ করে সেল ফোনটা বেজে উঠল। কলটা রিসিভ করতেই অপর প্রান্ত থেকে শুনতে পেলাম, 'হ্যালো, অবিনাশ দা, আমি শুভ বলছি'

'বলো' আমি বললাম।

'তুমিতো জানো, আমরা একটা পত্রিকা বার করছি'।

'হ্যা, পড়েছি, বেশ ভালো উদ্যোগ'।

'করোনা আতঙ্কের মধ্যেই আমাদের পত্রিকার শারদ সংখ্যা বের করবো, তোমার একটা লেখা চাই'।

'কিরকম লেখা তোমরা চাইছো ?'

'সমাজ কল্যাণমূলক, সমাজের ভালো হবে এই রকম লেখা'

মনে মনে ভাবলাম, বা বেশ ভালো চিন্তা ধারা। তার সাথে তো সমাজের কালো দিকটা তুলে ধরা। আর সেটাই তো হবে সমাজের ভালো করার প্রথম ধাপ। তাই আমি বললাম, 'আমার দুটো গল্প লেখা আছে, একটা 'হামাগুড়ি', আরেকটা 'গরম ভাত'। চলবে'

'দাদা, বিষয়বস্তুটা একটু বলবেন। মানে কোন বিষয়ের উপর গল্প দুটো লিখেছেন'

'হামাগুড়ি' গল্পটা মানব সভ্যতার নিয়ন্ত্রকদের ভূমিকা প্রসঙ্গে, আর 'গরম ভাত' গল্পটা বর্তমান সমাজের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে'

'তার মানে দুটো গল্পের মধ্যেই রাজনৈতিক ছাপ রয়েছে'

'হ্যা তা রয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে সাদাকে সাদা কালোকে কালো বলার সাহস'।

'কিন্তু দাদা, রাজনৈতিক ছাপ মুক্ত গল্প ছাপলে আমাদের পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের ছোট পত্রিকার উপরের চাপ আমরা সামলাতে পারবো না।' এমন লেখা দিন যার মধ্যে কোন রাজনৈতিক ছাপ নেই'।

কথাটা শুনে একটু অবাক হলাম মনে মনে ভাবলাম জলে না নেমে সাঁতার কাটবো কি করে ?' মুখে বললাম, 'বুঝলাম', মনে ভাবলাম ওদের আর দোষ কি, যখন ভয়কে জয় করার সাহস দেখানোর কেউ থাকে না, তখন সমাজ এভাবেই চলে।

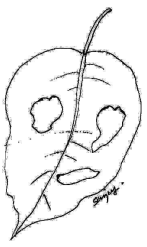

হামাগুড়ি দিয়ে।

শুভ আবার বলল, 'দাদা তাড়াতাড়ি একটা নতুন লেখা পাঠাবেন।

'ঠিক আছে। আমি চেষ্টা করছি', কথাটা শেষ হতেই শুভ লাইনটা কেটে দিল। মনে মনে বললাম 'দেখি ডাস্টবিন ঘেঁটে কি পাওয়া যায়।'

লোকসংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রবহমানতায় চিল্কিগড়

অমিত সিংহ

লোকসংস্কৃতির ধারা প্রবহমান নদীর মত যা অন্তঃহীন। লোকসংস্কৃতির 'লোক' বলতে সমাজের তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষজনকে বোঝানো হয়। এই শ্রেণীর রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, আমোদ-প্রমোদ এক কথায় জীবন যাপনের প্রতিটি অঙ্গের যোগফলই হল লোককৃতি। এইরকম লোককৃতির সুরেলা স্থান হল চিল্কিগড়, যা জনগণের নিকট উপজাতীয় সংস্কৃতি এবং ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতির আঁতুড়ঘর হিসেবে সমাদৃত। বনানীর স্নেহাঞ্চলে পাখিদের কলতান, ডুলুং নদীর কুল কুল শব্দ, মর্কটদের বিনোদন ভরা প্রকৃতিতে দেবী কনক দুর্গার অবস্থান, লৌকিক বিশ্বাসের মূর্ত প্রতিক। সাঁওতাল, কোল, ভীল, মুণ্ডা, ভূমিজ উপজাতিদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে চিল্কিগড় মন্দির প্রাঙ্গণ হয়ে উঠেছে মিলনায়তনের অঙ্গন।

নবগঠিত ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি থানার অন্তর্গত চিল্কিগড় ইতিহাস ও সংস্কৃতির আঙিনায় অনুপমা। ঝাড়গ্রাম শহর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে শালগাছ পরিবৃত ছায়াশীতল পথ অতিক্রম করলেই জামবনি রাজবংশের গড় চিল্কিগড়। বিবিধ ভেষজ উদ্ভিদের সমাহারে চিল্কিগড় আজ বাংলার প্রবেশদ্বার। এই শুভ মন্দির প্রাঙ্গণ ডুলুং নদীর নীরবতা, মর্কটদের মন ভরা আনন্দ দ্বারা নবাগতদের আগমন বার্তা প্রদান করে।

চিল্কিগড় এর অতীত শিকড় ধলভূম রাজবংশের সাথে জড়িত। গৌড় তথা বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ এর শাসনকালে (১৪৯৩-১৫১৯) তৎকালীন উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্র বর্তমান ঝাড়গ্রাম জেলার অন্তর্গত জামবনি পরগণা দখল করেন। এই অরণ্য সংকুল অঞ্চল দখল করার পর প্রতাপ রুদ্র তার বন্ধু বলভদ্র ত্রিপাঠী-কে ওই স্থানের শাসনভার অর্পণ করেন। নাম দেওয়া হয় ''টি-হাড়ি-গড়'' যা পরবর্তীকালে চিল্কিগড় রূপে পরিচিতি লাভ করে। জামবনি রাজবংশের গড়-চিল্কিগড়। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে গোপীনাথ সিংহ মত্ত জগ নামে এক রাজা ওই পরগণার শাসনভার গ্রহণ করেন। গোপীনাথ সিংহ মত্ত তাঁর কন্যার সাথে বর্তমান ঝাড়খণ্ডের ধলভূমগড়ের রাজা জগন্নাথ দেও-এর বিবাহ দেন। স্বভাবতই বলা যায় ধলভূমগড়ের রাজ পরিবারের সাথে জামবনি রাজবংশের যোগসূত্রতা ছিল।

মধ্যপ্রদেশের উত্তর সীমান্তে ধলভূম রাজ্য। ধলভূম রাজবংশের সূর্যবংশীয় রাজা ছিলেন রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের পুত্র ছিলেন বীর সিংহ। বীরসিংহের দুই পুত্র গুণধর সিংহ ও জগৎদেও সিংহ। গুণধর ও জগৎদেও এর পারস্পরিক বিবাদের কারণে জগৎদেও গৃহত্যাগ করে অধুনা ঝাড়খণ্ডের একাংশে চলে আসেন যা ছিল অরণ্য সংকুল। স্থানটি তাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের বিভীষিকা পেরিয়ে জগৎদেও তার পদবী পরিবর্তন করে ধবলদেব রাখেন। এইসময় পুরীর জগন্নাথ দেবের ধর্মীয় আরাধনার গৌরব বৃদ্ধি পেলে জগৎদেও তার নাম পরিবর্তন করেন। নাম হয় — জগন্নাথ ধবলদেব।

জগন্নাথ ধবলদেবের চতুর্থ পুত্র কমলাকান্ত ধবলদেব আনুমানিক ষোড়শ শতকে জামবনি রাজ্যের রাজা হন। কমলাকান্তের পুত্র মান গোবিন্দ। মান গোবিন্দের শাসনকালে অর্থাৎ ১৮৩১-১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চিল্কিগড়ের ধবলদেবের রাজবংশে 'সুবর্ণ যুগ' বিরাজমান ছিল। মান গোবিন্দ ছিলেন প্রজা কল্যাণকামী এবং সংস্কৃতি অনুরাগী। তার রাজত্বকালেই চিল্কিগড় এর শুরু হয় 'পরভা'। মান গোবিন্দের

দুই পুত্র হরিহর ও মধুসূদন। হরিহরের দুই পুত্র পূর্ণচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র। ১৮৬৩ সালে পূর্ণচন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র নাবালক হওয়ার জন্য জামবনি রাজবংশ 'কোর্টস অব ওয়ার্ডস' অধীনে চলে যায়। ঈশ্বরচন্দ্র সাবালক হয়ে রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের নামানুসারে তার পুত্র জগদীশচন্দ্র ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ১৪ একর জমিতে প্রতিষ্ঠা করেন চিল্কিগড় ঈশ্বরচন্দ্র ইনস্টিটিউশন। জগদীশচন্দ্রই (১৮৯১-১৯৫৭) ছিলেন জামবনি রাজবংশের শেষ রাজা। জগদীশচন্দ্র ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

রাজবাড়ীতে কূলদেবী রুক্মিণীর অবস্থান ঘন ঝোপে ঢাকা, প্রায় অপাংক্তেয়। রাজবাড়ীর দক্ষিণ দিক বরাবর কনক দূর্গা মন্দির। রাজবাড়ীতে রাধা গোবিন্দ মন্দির, শিব মন্দির রয়েছে। মন্দিরের দেবদেবী এখনও পুরোহিত দ্বারা পূজিতা।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটে। তবে থেকে যায় রাজাদের রাজবাড়ী। জামবনি রাজবংশের গড় তথা চিল্কিগড় রাজবাড়ির অবস্থা ভগ্নপ্রায়। এই রাজবাড়ির অতীতের আবর্তে রয়েছে অনেক ঘটনা যা এখনো সজীব ও প্রাণবন্ত।

তথ্যসূত্র :

সুব্রত মুখোপাধ্যায়, জঙ্গলমহলের জনসংস্কৃতি।
বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ২য় সংস্করণ, ২ খণ্ড।
মধূপ দে, ঝাড়গ্রাম ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ৩য় সংস্করণ।
যোগেশচন্দ্র বসু, মেদিনীপুরের ইতিহাস।
আন্তর্জাতিক সহযোগ ব্যবস্থা (ইন্টারনেট)।

আত্মজা

সুস্মিতা রায়চৌধুরী

আজ দশমী, এমনিতেই এই দিনে বাঙালির মন একটু ভারাক্রান্ত থাকে, চারিদিকে বিষাদের সুর তারপর সকালে প্রতিটা সংবাদপত্রের শিরোনামে এই খবর। 'আজকের সময়' পত্রিকার কর্ণধার, রজত মুখার্জী, নবমীর রাত্রেই আত্মহত্যা করেছেন। উনি যে শুধু ওই পত্রিকার কর্ণধার ছিলেন এমন তো নয়, ছিলেন একজন নির্ভীক সাংবাদিকও। ওনার ক্ষুরধার লেখনী, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, এস্ট্যাব্লিশমেন্টের বিরুদ্ধে গিয়ে লেখায়, তিনি সহজেই পাঠকের মন জয় করে নিয়েছিলেন। তেমনি কিছু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দর অসন্তোষের কারণও হয়ে উঠেছিলেন। তাই ওনার খুন হওয়ার সম্ভাবনাটাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। যদিও পুলিশ বলছে তদন্ত চলছে। অবশ্য এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও প্রমাণও পাওয়া যায় নি। এমন একজন সফল মানুষ আত্মহত্যা করবেন কেন ? কোন সুইসাইড নোটও পাওয়া যায়নি। যদিও প্রাথমিক তদন্তে গলায় দাগ দেখে পুলিশ আত্মহত্যা বলেই মনে করছে।

তবে রজত মুখার্জী শুধু সাংবাদিক বা সংবাদপত্রের কর্ণধারই ছিলেন না, তিনি ছিলেন কলকাতার বিখ্যাত মুখার্জী পরিবারের সন্তান। কলকাতায় যত বনেদি পরিবারের দুর্গা পুজো হয়, তাদের মধ্যে একটি এই মুখার্জী বাড়ির পুজো। রজতবাবুরা ছিলেন দুই ভাই। রজতবাবু সারাজীবন বিয়ে করেননি। ওনার দাদা ছিলেন, সজল মুখার্জী, উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার। বেশ কয়েক বছর আগেই তিনি গত হয়েছেন। ওনার এক মেয়ে এবং এক ছেলে। মেয়ে রিমা এখন বিয়ের পর কানাডাতে সেটলড্। ছেলে আহির কাকার সংবাদপত্রের অফিসেই কাজ করে। এখনও বিয়ে হয়নি। আর আছেন সজল বাবুর বিধবা স্ত্রী, মায়া মুখার্জী। আর দু-একজন ঠিকে কাজের লোক। ইদানিং আহির একজন নতুন কম বয়সী ড্রাইভার রেখেছে। সেও এই বাড়িতেই থাকে। এই নিয়েই রজত বাবুর পরিবার। তবে পরিবার ছাড়া আর যে দু'তিনজন মানুষ রজত বাবুর কাছের, তাঁরা হলেন ওনার ছোটবেলার দুই বন্ধু অজয় চক্রবর্তী এবং তপন বোস।

ওনারা তিনজনই ছিলেন অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। সেই স্কুলে পড়ার সময় থেকে। অজয় চক্রবর্তী হলেন এই শহরের বিখ্যাত উকিল। ওনারা সপরিবারে দক্ষিণ কলকাতায় থাকেন। তপন বোস আর ওনার স্ত্রী মালা বোস দুজনেই ছিলেন অঙ্কের শিক্ষক। আর ওদের একমাত্র মেয়ে উমা। উমার জন্মের কয়েক বছর পরই এক ভয়ঙ্কর গাড়ী দুর্ঘটনায় তপন বোস আর ওনার স্ত্রী দুজনই মারা যান। শুধু বেঁচে যায় ওনার মেয়ে ঊমা বোস। তারপর থেকে ঊমার সব দায়িত্ব নেন রজতবাবু। দার্জিলিং-এর এক বিখ্যাত বোর্ডিং স্কুলে রেখে উমাকে পড়াশোনা করিয়েছেন। সে এখন একটা হোস্টেলে থেকে ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করছে। সেই সাথে রজতবাবুর কাগজে মাঝে মাঝেই লেখালেখি করে ঊমা। লেখার স্টাইলও অনেকটাই রজতবাবুর মতো। কিছুদিনের মধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে মেয়েটির লেখনী। খুব পরিশ্রমী, সপ্রতিভ মেয়েটি। পড়াশোনা শেষ হলে রজতবাবুর কাগজেই স্থায়ীভাবে কাজ করার কথা ঊমার। রজতবাবুও খুব স্নেহ করেন ঊমাকে।

অন্যদিকে রজতবাবুর ভাইপো একেবারেই বিপরীত মেরুতে বিচরণ করেন। কথাবার্তায় প্রতিমুহূর্তেই বুঝিয়ে দেন যে, তিনিই এই প্রতিষ্ঠানের মালিক। অফিসে এসে শুধু সকলের ওপর ছড়ি ঘোরানো ছাড়া উনি প্রায় কিছুই করেন না। লিখতে উনি পারেন না। যদিও কোনওদিন সেই চেষ্টাও উনি করেননি। ঊমার সাথে কখনও দেখা হলে উনি বুঝিয়ে দেন যে, আজ ঊমা যা কিছু করেছে সবই তার কাকার দয়াতে। কিছুদিন আগে অবশ্য আহির নিজেই তার কাকার কাছে ঊমাকে বিয়ের ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিল। কিন্তু রজতবাবু সাথে সাথেই তা খারিজ করে দেন।

ঊমাকে রজতবাবু নিজের বাড়িতে কখনই আনতেন না। এমনকি নিজের বাড়ির দুর্গা পুজোতেও না। উনি গিয়ে দেখা করে আসতেন ঊমার সাথে। কখনও কখনও ওঁনার বন্ধু অজয় বাবুও যেতেন। এই নিয়ে ঊমার মনেও একটা ক্ষোভ, অভিমান সহ একটা কৌতুহলও ছিল। যে বাড়ির দুর্গা পুজোতে শহরের এত লোকজন আসে, ভোগ খায়, অনেক টিভি চ্যানেলে দেখানো হয় এই পুজো। সেখানে ঊমাকে উনি এত ভালোবাসা সত্ত্বেও কখনও পুজোতে ডাকেন নি।

তবে এই বারের দুর্গা পুজোটা ব্যাতিক্রম। এই প্রথমবার ঊমাকে তিনি দুর্গা পুজোতে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। কানাডা থেকে ভাইঝিকেও আসতে বলেছেন। তার বন্ধু উকিল অজয় চক্রবর্তীকেও আসতে বলেছেন। তার অবশ্য একটা কারণও আছে। তিনি বলেছিলেন, দশমীতে মা এর বিসর্জনের পর তিনি সকলের সাথে তার উইল নিয়ে আলোচনা করতে চান। কলকাতার বাড়ি আর বিশেষ করে সংবাদপত্রের মালিকানা কে পাবে, তা জানাতে চান এবং সকলের সামনে উইলে সই করতে চান। পুরো পুজোটা উনি খুব আনন্দ করেই কাটিয়েছেন, বিভিন্ন চ্যানেলে বাইটও দিয়েছেন কিন্তু তারপরে নবমীর রাত্রে এমন একটা ঘটনা।

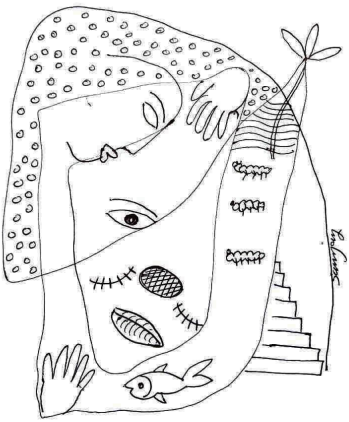

ঘটনাটা প্রথম লক্ষ্য করে ঊমাই। সকালে ঘুম থেকে উঠে রজতবাবুর ঘরে ওই প্রথম ডাকতে গিয়েছিল। অবশ্য আহিরই ওকে রজতবাবুকে ডেকে আনতে বলেছিল। ওনার ঘরে গিয়ে ঊমা দেখে, রজতবাবু গলায় দড়ি দিয়ে ফ্যানের সাথে ঝুলছেন। ঊমা চিৎকার করে বাড়ির সবাইকে ডাকে। বডি নামানোর সময় বাড়ির ড্রাইভারকে ডাকা হলে জানা যায় যে, সে নাকি আজ ভোরেই আহিরের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে গ্রামের বাড়ি গেছে। এরপর বাড়ির লোকেরা প্রতিবেশীদের সাহায্য নিয়ে বডি নামায় এবং পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ অবশ্য প্রাথমিক অনুসন্ধানে আত্মহত্যাই বলেছে। তবে সেটা রজতবাবুর উকিল বন্ধু অজয় চক্রবর্তী কিছুতেই মানতে চাইছেন না। ওনার মতে রজতবাবুকে খুন করা হয়েছে। পুলিশের কাছে উনি সেইমত অভিযোগ করেছেন। তাই নতুন করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

যদিও ঘটনার পর থেকে রজতবাবুর বৌদি মায়াদেবী এবং আহির বাবু ঊমাকেই দোষ দিয়ে যাচ্ছেন। ঊমাই নাকি খুব অপয়া। ছোট বেলাতে বাবা-মাকে খেয়েছে আর এখন তার দেওর। প্রথম বছর পুজোতে এই বাড়িতে এল, আর তারপরই এই অঘটন। আহিরবাবু তো রজতবাবু এবং ঊমাকে নিয়ে কিছু খারাপ মন্তব্য করতেও ছাড়ল না। তবে অজয় বাবুর ইচ্ছা এবং কিছুটা জনগণের চাপে পুলিশ আবার নতুন করে তদন্ত শুরু করল। এই ব্যাপারে তাদেরকে বেশ কিছু গোপন তথ্য দিয়েও সাহায্য করেছেন অজয় বাবু। পুলিশ বাড়ির লোকেদের প্রত্যেকের সাথে আলাদা করে কথা বলেছে এবং তদন্তের স্বার্থে সকলের ফোনগুলোও নিয়ে গেছে। ফরেন্সিক টিমও এসেছে, তারা ফিংগার প্রিন্ট নিয়ে গেছে সকলের। পুলিশ ড্রাইভারের গ্রামের ঠিকানাও আহিরের কাছ থেকে নিয়েছে।

এর ঠিক দুদিন পর পুলিশ বাড়ির সকলকে একসাথে থাকতে বলে জানায়, সকলের সামনেই তারা রহস্যের উন্মোচন করবেন। উমা দেবী এবং অজয়বাবুও যেন সেখানে অবশ্যই উপস্থিত থাকেন। তেমনই নির্দেশ দিয়েছে তাঁরা।

যথাসময়ে পুলিশ বাড়ির ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে মুখার্জী বাড়ির ড্রইং রুমে হাজির হলো। বাড়ির সমস্ত সদস্যরাও হাজির।

এবার পুলিশ কথা শুরু করল 'অজয় বাবুর কথাটাই ঠিক, রজতবাবু আত্মহত্যা করেননি, তিনি খুন হয়েছেন। তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুন করে, দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

'তাহলে এটা নিশ্চয়ই কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা খুন। কাকার তো রাজনৈতিক শত্রুর অভাব ছিল না।' আহির খুব গম্ভীরভাবে বলল।

'সত্যি কি তাই আহির বাবু ? বরং খুনটা হয়েছে সম্পত্তির জন্য এবং করেছে বাড়িরই লোক। সেই জন্য ঠিক উইল সই করার আগের দিন উনি খুন হলেন। 'চমকে ওঠে আহির। থতমত খেয়ে তোতলাতে তোতলাতে আহির বলে, 'বাড়িতে ক... ক... কে... খুন করবে কাকাকে ?'

'আমি বলবো ?' পুলিশ ভদ্রলোকটি বললেন।

'কিন্তু আমার দেওরকে সম্পত্তির জন্য কেন কেউ খুন করবে ? আমার ছেলে এ বাড়ির একমাত্র বংশধর। উইল করলেও সে সম্পত্তি পাবে, না করলেও সেই পাবে। আমার দেওর তো নিজের ভাইপো থাকতে অন্য কাউকে সম্পত্তি দান করতে যাবেন না।' মায়াদেবী বললেন।

'আপনারার ছেলেও ছোট থেকে সেই কথাটাই জানত। তাই নিজেকে তৈরি করার কোন চেষ্টাই তিনি করেন নি। কিন্তু সমস্যা হলো কিছুদিন আগে উনি রজতবাবু আর অজয়বাবুর মধ্যে উইল সংক্রান্ত আলোচনাটা শুনে ফেলেন এবং জানতে পারেন যে সে নয়, উইল করে তার কাকা সম্পত্তি দিয়ে যেতে চান অন্যকে। আর ঠিক তখন থেকেই আহিরবাবু তার কাকার উইল সই করার আগেই তাঁকে কি করে এই পৃথিবী থেকে সরানো যায় সেই চেষ্টাই করছিলেন কারণ যদি উইল না হয়ে থাকে, তা হলে রজতবাবুর সমস্ত সম্পত্তি আইনগত ভিত্তিতে পাবেন আহির বাবু এবং ওনার দিদি রিমা দেবী। আর রিমা দেবী তো বিয়ের পরই বলেছিলেন তিনি বাপের বাড়ির সম্পত্তির ভাগ নেবেন না। কারণ বিয়ের সময়ই রজতবাবু অনেক খরচ করে ওনার বিয়ে দিয়েছিলেন। তাই সবটা পাবেন আহিরবাবু' এই পর্যন্ত বলে পুলিশ অফিসার একটু থামলেন। সকলে কৌতুহলী দৃষ্টি নিয়ে পুলিশ অফিসারের দিকে তাকিয়ে। অফিসার আবার বলতে শুরু করলেন,

সেই জন্য উনি ফোনে শেষ কয়েকদিন গুগল এবং ইউটিউবে কিভাবে শ্বাসরোধ করে মারা যায় সেটাই সার্চ করেছেন, প্ল্যান করেছেন, আর ওনার সাহায্যকারী হিসাবে ড্রাইভার সুজয়কে এই বাড়িতে এনেছেন। ড্রাইভার সুজয়কে আমরা অলরেডি গ্রেফতার করেছি এবং চাপের মুখে সে সবটা স্বীকারও করেছে। রজতবাবু রোজকার মত একটা ডক্টর প্রেসক্রাইব করা ঘুমের ওষুধ খেয়ে যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তখন আহিরবাবু মোবাইল চার্জারের তারটা গলায় পেঁচিয়ে ওনাকে শ্বাসরোধ করে খুন করেন এবং তারপর তিনি আর ড্রাইভার মিলে রজতবাবুর বডিটা দড়ি দিয়ে উপর থেকে ঝুলিয়ে দেন।' মোবাইল চার্জারে ওনার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। ঘরের মধ্যেও ওনাদের ফুটপ্রিন্ট পাওয়া গেছে।

'কিন্তু কাকা সম্পত্তি কাকে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, আর কেন ?' রিমাদেবী জানতে চাইলেন।

'এবার অজয়বাবু বলবেন' পুলিশ অফিসার বললেন।

'তোমার কাকা শুধু সম্পত্তি দিয়ে যেতে নয় অলরেডি উইল করে দিয়ে গেছেন। সেই উইল আমার কাছে আছে। উনি দশমীর দিন শুধু সকলের সামনে সেটা জানাতে চেয়েছিলেন। তবে উইল হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আমি আর রজত ছাড়া কেউ জানত না। তোমার ভাই আহিরও নয়।' অজয়বাবু একটু থেমে আবার বললেন, 'তোমাদের কাকাবাবু, মানে আমার বন্ধু রজত তার এই বাড়ির অংশ

এবং সংবাদপত্রের পুরো মালিকানা ঊমা বোস-এর নামে করে গেছেন। আহির চইলে সেখানে কাজ করতে পারে মাস মাইনের ভিত্তিতে। এছাড়া তোমাকেও তিনি কিছু টাকা দিয়ে গেছেন। সেই অঙ্কটা খুব একটা কম নয়।'

'কিন্তু আমাকে কেন সব সম্পত্তি দিয়ে গেছেন রজতকাকু ? আমি তো কিছু চাইনি।' প্রশ্ন করে ঊমা।

'কারণ রজতের সবকিছু তোমারই প্রাপ্য। তুমি রজতেরই আত্মজা, মানে তার মেয়ে। এই ঘটনাটা জানি শুধু আমরা। রজতের দুই বন্ধু। মানে তোমার বাবা আর আমি। আর জানতেন তোমার মা এবং রজতের বাবা শুভময় মুখার্জী। যিনি এখন আর নেই। আর এটা কিছুদিন আগে জেনে গিয়েছিল আহির। তাই ও এই ঘটনাটা বাইরে আসার আগেই রজতকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল সম্পত্তি পুরোটা পাওয়ার লোভে। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। আসলে রজত আর তোমার মা ছোট থেকেই একে অপরকে খুব ভালোবাসতেন। বিয়ে করবে ঠিকও ছিল। কিন্তু তোমার ঠাকুরদা, মানে রজতের বাবা শুভময় কাকু কায়স্থ পরিবারের এমন এক নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েকে কখনই বাড়ির বউ করতে চাননি। উনি বলেছিলেন তোমার মাকে বিয়ে করলে উনি আত্মঘাতি হবেন। আর ততদিনে মালার গর্ভে তুমি এসে গেছ। তাই তোমার মাকে বিয়ে করেন, আমাদের আর এক বন্ধু তপন বোস। মানে যাকে তুমি এতদিন বাবা বলে জেনে এসেছ। ওদের মৃত্যুর পর খুব সহজেই তোমার সব দায়িত্ব রজত নিয়েছিল। এটা কোন দয়া ছিল না। আহির এবার বুঝেছো তো কেন তোমার কাকা ঊমার সাথে তোমার সম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি ?' এই বলে অজয় বাবু থামলেন। অজয়বাবু'র কথা শেষ হতেই মায়াদেবী বলে উঠলেন,

'যে সম্পর্ক আমার শ্বশুরমশাই মেনে নিতে পারেননি, সেই সম্পর্ক আমিও মেনে নিতে পারবো না।' একটু হেসে অজয়বাবু বলেন,

'বৌদি এই বংশ পরিচয়, বংশমর্যাদা, বংশধর, জাতপাতের বিভেদ, ঠুনকো আভিজাত্যে এই চিন্তাধারাগুলো এবার বদলানোর সময় এসেছে। মানুষ পরিচিত হোক তার কর্মে, মানবিকতায়, তার মূল্যবোধে, শুধু তার বংশ পরিচয়ে নয়। সেইজন্য রজত ঊমা মা কে এই বংশের পরিচয়, আর এই বাড়ির বাইরে রেখে সফলভাবে মানুষ করেছে। নিজে আর বিয়ে পর্যন্ত করেনি। যদি আহিরের মাথাতেও আপনারা সকলে মিলে এই বাড়ির একমাত্র বংশধর, সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী এই ধারণাগুলো না ঢোকাতেন, সে একজন ভালো মানুষ তৈরি হত, সম্পত্তির জন্য নিজের কাকাকে খুন করার মত এমন অমানবিক কাজ সে করত না।

আর ঊমা মা তুমিও তোমার কাজ দিয়ে, তোমার বাবা যে জাতপাতের ঊর্দ্ধে গিয়ে মনুষ্যত্বকে বড় করার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেটা পূরণ করো। প্রতিটি মেয়ের মধ্যেই মা দুর্গা বিরাজমান। যারা যুগ যুগ ধরে অশুভ যা কিছু সব দূর করে শুভশক্তির সূচনা করে।'

'আহিরবাবু আপনাকে এবং ড্রাইভার সুজয়কে আমার রজতবাবুর খুনের দায়ে গ্রেফতার করছি। আপনি আমাদের সঙ্গে থানাতে চলুন' পুলিশ অফিসারটি বললেন।

অজয় বাবু এসে এবার ঊমার মাথায় হাত রাখলেন আর বললেন,

'জান তো মা দুর্গার আর এক নাম ঊমা। এই নামটা রজতেরই দেওয়া। আর শুধু ছেলে হলেই বংশধর হয় না, তাঁকে তার যোগ্যও হতে হয়। তুমি এখন থেকে এ বাড়ির দুর্গা পুজো, সংবাদপত্রের অফিস মা দুর্গার মত সব সামলাবে। সে যোগ্যতা যে তোমার আছে, সেটা রজত বুঝেছিল। তাই সব দায়িত্ব তোমাকেই দিতে চেয়েছিল। এখন থেকে এই সব রক্ষা করার সব দায়িত্ব তোমার।'

ঊমা নীচু হয়ে অজয়বাবুর পা ছোঁয়। অজয়বাবু ঊমার মাথায় হাত রেখে বলেন,

'ভালো থাকো তুমি মা।'

সংস্কৃতি সংস্কার

শুভশ্রী সরকার

সংস্কৃতি ও সংস্কারের মধ্যে কোনটি বড় ?

'সংস্কৃতি' মানে যুগ যুগ ধরে চলে আসা মানুষের বিশ্বাস আচার-আচরণ, ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, রীতি-নীতি, নিয়মকানুন উৎসব গানবাজনা, সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদি সংস্কৃতির সাহায্যে আমরা মানুষ চিনে নিতে পারি কে পাঞ্জাবী, কে শিখ, কে বিহারী, কে হিন্দু, কে সুসলিম, সংস্কৃতি বংশ পরম্পরায় যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। হিন্দু, মুসলিম ও খ্রীষ্টানদের বিবাহের নিয়ম কানুন আলাদা। বিবাহের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই যে যার সংস্কৃতিকে follow করে। বাঙালীদের ক্ষেত্রে বিয়েতে গায়ে হলুদ, শুভদৃষ্টি, মালাবদল, সিঁদুর দান, সাতপাকে ঘোরা এসব rituals প্রচলিত আছে। মুসলিমদের 'কবুল হ্যায়' বললেই বিবাহ সম্পন্ন হয়। আবার খ্রীষ্টানদের চার্চে গিয়ে 'ring-ceremony'-র মাধ্যমে বিবাহ হয়। জন্মগত সূত্রে যে যেমন সংস্কৃতি মেনে এসেছে, সে সেভাবে চলবে। বিভিন্ন ফুলের particular একটা গন্ধ থাকে, এটা তাদের সংস্কৃতি এবারে দেখলেন রজনীগন্ধ্যা ফুলের গন্ধ যদি বেলী ফুলে পাওয়া যায়, সেটা বেমানান দেখায়। তাই প্রত্যেকের উচিত নিজ নিজ সংস্কৃতিকে মেনে চলা। সংস্কৃতিতে কোন কিছুর রাতারাতি পরিবর্তন ভালো নয়, সংস্কৃতি মানুষের অভ্যন্তরীন ব্যাপার। ব্যাপারটিকে বাইরে এনে বিকৃত করলে এর কোন মাহাত্ম্য থাকে না। হিন্দু নারীরা বিবাহের পর শাঁখা, সিঁদুর পরে, তাদের সংস্কৃতিকে স্মরণ রেখে, তবে এখনকার modern যুগে এসব প্রায় লুপ্ত-প্রায় এবারে কে সংস্কৃতি মানবে, আর কে মানবে না, সেটা তার ব্যাপার।

অন্যদিকে 'সংস্কার' হল এমন কিছু কাজ, যা ভবিষ্যৎ জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলে। সংস্কার মনুষ্যসৃষ্ট, এটা পরিবর্তনশীল। একটা ব্রীজ ভেঙে গেলে পুনরায় নতুন ব্রীজ বানানো হয়, এটা হল সংস্কার। সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ এসব ছিল প্রাচীনকালের সংস্কার। প্রাচীনকালে স্বামী মারা গেলে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় বিধবা স্ত্রীকে জীবন্ত দাহ করার একটা হিন্দু প্রথা হল সতীদাহ প্রথা। বিভিন্ন ধর্মীয় অজুহাত দেখিয়ে হিন্দু বিধবাদের জোর করে সতী হতে বাধ্য করা হত। এসব সংস্কার একদিনে দূর হয়নি। রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় হিন্দু সমাজ এই পৈশাচিক সংস্কার থেকে মুক্তিলাভ করেছিল। কথিত আছে, পবিত্র গঙ্গায় স্নান করলে নাকি পাপমোচন হয়। এগুলো একপ্রকার সংস্কার। যার পেছনে কোন ভিত্তি নেই। আমি যদি মানুষ খুন করে গঙ্গায় স্নান করে পাপমোচন করতে চাই, তাহলে আদৌ কি আমার পাপ ধুয়ে যাবে ? ? আমি নিজে যদি সৎ পথে চলি, তাহলে পাপ কোনওদিনও আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

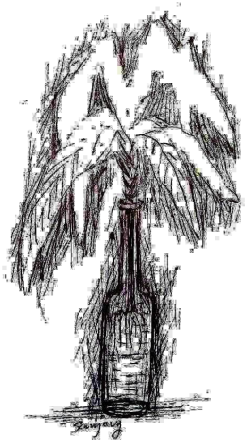

পরিশেষে বলা যায় যে, সংস্কৃতি permanent হলেও সংস্কার চিরস্থায়ী হয় না। সংস্কৃতিই সমাজের দর্পণ। তাই সংস্কৃতি ও সংস্কারের মধ্যে, সংস্কৃতিটাই বড়।

প্রতিপালন

জয় সান্যাল

সুদীপ ও অঞ্জনা বিশ্বাস, আপাত সুখী পরিবার কিন্তু ভিতরে চূড়ান্ত অসহায়, কারণ তাদের একমাত্র ছেলে বিপ্লবকে তারা মানুষ করতে পারেনি, কষ্ট কি তা তারা বিপ্লবকে কোনোদিন বুঝতে দেয়নি, যখন যা চেয়েছে মুখ থেকে বেরোবার সাথে সাথে তার যোগান দিয়েছে। উচ্চ শিক্ষার জন্যে সাত বছর আগে তারা বিপ্লবকে আমেরিকা পাঠিয়েছিল। কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি, এমন কী বাবা-মায়ের সাথে কোনো যোগাযোগই রাখেনি, কিন্তু বিপ্লব ভুলে গেলেও মা-বাবা কি সন্তানকে ভুলতে পারে ? আজ বিপ্লবের ২৬ তম জন্মদিন, তাই সকাল থেকে অঞ্জনা ও সুদীপের মনটা ভারাক্রান্ত।

অঞ্জনার কেন জানি মনে হচ্ছে কেউ বোধ হয় এসেছে ... এই ভেবে ভেবে সকাল থেকে চারবার সদর দরজা খুলেছে। শুন্য চোখে কাউকে খুঁজেছে ... আবার ছল ছল চোখে দরজা বন্ধ করে ফিরে এসেছে। সুদীপ সব-ই লক্ষ্য করেছে কিন্তু কিচ্ছু বলতে পারেনি। কিন্তু এবার সত্যিই যেন কেউ সদর দরজায় শব্দ করল। হ্যাঁ নিশ্চিত শব্দ হয়েছে, অঞ্জনা সুদীপ দুজনেই শুনেছে। অঞ্জনা ছুট্টে গিয়ে দরজা খুলল, কিন্তু একী ? ? একটা জরা-জীর্ণ-শীর্ণ ১২-১৩ বছরের ছেলে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ গুলো তার কোঠরে ঢোকানো কিন্তু বেশ গভীর। অঞ্জনা কিছু বলার আগেই ছেলেটা বলল আমাকে কিছু কাজ দিন না, যা দেবেন তাই করে দেবো। দিন না কোনো কাজ (হাত জোড়ো করে) ? ? ভেতর থেকে সুদীপ বলল না-না ওইটুকু ছেলে আবার কী কাজ করবে ? তারপর একগাদা পয়সা চাইবে। ছেলেটা প্রত্যুত্তরে বলল না-না বাবু আমাকে একটা পয়সাও দিতে হবে না শুধু কিছু খাওয়ার দিলেই হবে। এই কথা শুনে অঞ্জনার কেমন যেন মায়া হল, ভাবল ছেলেটি বোধ হয় কয়েকদিন না খেয়ে আছে ... তাই সে বলল আচ্ছা-আচ্ছা কাজ না হয় করবি ক্ষণ এখন এদিকে আয় আর চুপটি করে বোস, কিছু খেয়ে নে। কিন্তু ছেলেটি বলল — না না তা হয় না, আগে আমি কাজ করব তার পরে যা হোক খেতে দেবেন, আমি বরং আপনাদের এই সামনের বাগানটা পরিষ্কার করে দিই ? অঞ্জনা আর কথা বাড়াল না, তাকে কাজের সম্মতি দিয়ে ভিতরে চলে গেল।

ঘণ্টা ২ পরে ওই ছেলে আবার ডাকল, তখন অঞ্জনা বাইরে এসে দেখল সত্যি ছেলেটি বাগানটি দারুণ ভাবে পরিচ্ছন্ন করেছে। ফলে সে খুব খুশি হল এবং ছেলেটাকে ভালো করে হাত-পা ধুয়ে নিতে বলল। এর পর একটা প্লেটে নিজের ছেলের জন্মদিনের করা লুচি, আলুর দম, পায়েস ও দুটো মিষ্টি দিল ছেলেটাকে খেতে। কিন্তু অবাক করে দিয়ে ছেলেটা খেলনা, একটা পলিথিন চাইল অঞ্জনার কাছে। প্রত্যুত্তরে অঞ্জনা বলল পলিথিন কী হবে ? সকালে বললি খিদে পেয়েছে ? নে নে তুই এগুলো খেয়ে নে!

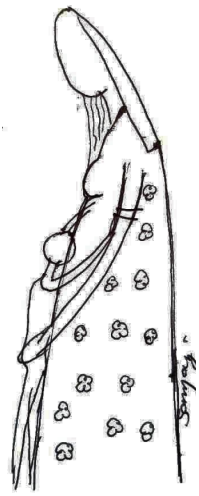

তখন ছেলেটি একটু ইতস্তত করে বলল না গো না, আমি আমার খাওয়ার জন্য কাজ করিনি, ঘরে আমার মা আছে, কিন্তু বেশ কদিন মায়ের খুব অসুখ, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি, সরকারি হাসপাতাল থেকে মায়ের ওষুধ এনেছি। কিন্তু কয়েকটা ওষুধ কিছু খাওয়ার পরে খেতে হবে। তাই এই খাওয়ারগুলো নিয়ে গিয়ে মাকে খাওয়াবো তারপর ওই ওষুধগুলো খাওয়াবো। মা যত তাড়াতাড়ি সুস্থ হবে ততই আমার ভালো, আমাকে আর কাজ করতে হবে না, মা-ই আগের মতো বাবুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করবে। প্রায় এক নিঃশ্বাসে ছেলেটি এতগুলো কথা বলল।

অঞ্জনার চোখে জল চলে এল। নিজেকে সামলে সে বলল, ঠিক আছে, তুই এগুলো খেয়ে নে বাবা, আমি তোর মায়ের জন্য আরও দিয়ে দেবো।

অঞ্জনা ভিতরে গেল আর মনে মনে ওই রত্নগর্ভা মায়ের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করল। মনে মনে ভাবতে লাগল তারাও তো বিপ্লবের কোনো ত্রুটি রাখেনি, তাহলে সে কিভাবে কেন এমন অমানুষ হল ? নিজের মা-বাবাকে ভুলে গেল ? অঞ্জনা চোখ মুছে অনেক বেশি করে খাওয়ার মায়ের জন্য দিয়ে দিল। সাথে ২০০ টাকাও দিল। আর বলল, শোন কাল থেকে তোর কাজ রোজ সকালে এ বাড়িতে আসা। ছেলেটা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল কী কাজ... অঞ্জনা ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল সে তুই আসলেই বলব। আর হ্যাঁ - মা যতদিন না সুস্থ হচ্ছে তুই তোর মায়ের খাওয়ার রোজ আমার কাছ থেকেই নিয়ে যাবি। ছেলেটা খুব খুশি হয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ির দিকে চলল। অঞ্জনা মনে মনে একটু যেন শান্তি পেল। কেন জানি না এখন আর ছেলের জন্য কষ্ট হচ্ছে না তার।

লাকি বয়

তপন সনগিরি

ছোটবেলায় পড়েছিলাম গাধার কান মুলে ফুটবলে ট্রফি জয়ের কথা। আজ আবার সেকথাই যেন মনে পড়ে গেল, যখন অমিতেশ লটারিতে কড়কড়ে পঁচিশ-শ টাকা জিতে জগাকে বিস্কুট খাওয়াচ্ছিল। জগাই নাকি আজ তার লাকি বয়। পরনের পোশাক আর ঠোঁটকাটা স্বভাবই বোধহয় জগন্নাথকে 'জগা'-য় রূপান্তরিত করেছে! রাজনীতি আর পাড়া প্রতিবেশীর সব খবর তার জলভাত, এ বিষয়ে তার থেকে বেশি পারদর্শী এ তল্লাটে বোধ হয় আর কেউ নেই, জগা অন্তত সেটাই মনে করে! পরনের ফুল প্যাণ্টটা গুটিয়ে হাফ প্যাণ্টে পরিণত করা আজ তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল আর কঙ্কালসার দেহটিকে প্রতিদিন একবার না দেখলে অমিতেশের মতো অনেকেরই আবার ভালো কাটেনা।

জগন্নাথ ওরফে জগা এখন ছোট্ট একটা খাবার দোকানের ডেলিভারি বয়, কাজের প্রতি ভালোবাসা আর মালিকের মন জয় করেই নিয়ত তাকে চলতে হয়। পান থেকে চুন খসলেই কাস্টমারের গালমন্দ শোনা যেন উপরি পাওনা কিন্তু তা হজম করা আবার তার আদতে নেই। কেউ একটা বললে সে তাকে একশ কথা শুনিয়ে তবেই ছাড়ে। সামনে না পারলেও অন্তত পিছন থেকে ছুরি না মারা পর্যন্ত তার শান্তি নেই। সবাইকে খাইয়ে কাজের শেষে মালিকের অনুমতিতে যখন সে ব্রেড চপ খায় তখন সারা দিনের ক্লান্তি আর দারিদ্রতা নিমেষে কোথায় যেন হারিয়ে যায়, চোখে মুখে ফুটে ওঠে এক অদ্ভুত তৃপ্তি।

নিয়তির নিদারুণ পরিহাসে সোনার চামচ মুখে দিয়ে সে হয়ত জন্মায়নি, কিন্তু আর পাঁচটা সোনার লালের মতো সেও স্বপ্ন দেখে বড়ো হওয়ার-ভালো থাকার। অসুস্থ বাবা-মার আশীর্বাদ পাথেয় করে বিন্দু বিন্দু অর্থ উপার্জনের মধ্য দিয়ে সিন্ধু তৈরির লড়াইয়ে তাকে যে বেঁচে থাকতেই হবে! সেও যে কারো পদ্মলোচন, কারো নীলকমল কারো জগন্নাথ। কেউ তো জীবনের অন্তিম প্রহর পর্যন্ত তাকে লতার মতো আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়, আগলে রাখতে চায় ডিম যেভাবে কুসুমের মধ্যে প্রাণকে লুকিয়ে রাখে। শুধু ইহজন্মেই নয়, এ জীবনের পরেও পঞ্চত্ব প্রাপ্তির জন্য কেউ তো অপেক্ষা করে আছে এই লাকি বয়ের!

রিভার্স মেটাপরফসিস

সুমন চ্যাটার্জি

আমি সম্পূর্ণা এক সাধারণ মেয়ে অন্য সমস্ত মেয়েদের মতোই অতি সাধারণ আর এই গল্পের সামান্য কথক মাত্র। আমার এই নামটা কে যে সম্পূর্ণতার সবুজে রাঙিয়ে ছিল সে শামীমা। ক্লাস ফাইভ থেকে আমাদের বন্ধুত্ব সম্পূর্ণ করে রেখেছিল, আমাদের বেশ কাটছিল দিনগুলো আড্ডা, খেলা আর পড়াশোনার মাঝে বেড়ে ওঠা নির্বিকল্প ভালোবাসার সাথে বন্ধুত্ব। শামীমা দেখতে খুবই সুন্দর যেমন মুখশ্রী, তেমন টানা টানা চোখ, গায়ের রঙ খুব ফর্সা। ছেলেরা প্রেমে পাগল না হয়ে আর যায় কোথায়। রোজ প্রপোজ পেত তো কারো না কারো কাছ থেকে। আর রোজ সমস্ত কথার ঝুড়ি এনে রাখতো আমার কাছে।

সেদিন যে কত তারিখ ছিল তা মনে নেই, তবে আমরা দুজনেই ক্লাস নাইন, সাইকেলে স্কুল আসছি দুজনেই। একটা ছেলে দেখে মনে হয় বড় বাড়ির কলেজে পড়বে হয়তো, আমাদের কাছে এসে বাইকের স্পিডটা কমিয়ে শামীমার সাথে কথা বলার চেষ্টা করল। আমরা দুজনেই পাত্তা না দিয়ে এগিয়ে গেলাম, স্কুল পৌঁছে দুজনেই সে কি বিরক্তি। পরের প্রায় এক সপ্তাহ বা কিছু বেশি সময় ধরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। কিন্তু শেষ দিনগুলোতে শামিমার কাছ থেকে বিরক্তির ছাপ খুঁজে পাওয়া গেল না বরং কিছুটা খুশি ও দিন খানিক পেরোতে না পেরোতেই ওর কাছ থেকে খবর পেলাম ছেলেটার প্রশ্নে হ্যাঁ উত্তরটাই দিয়েছে।

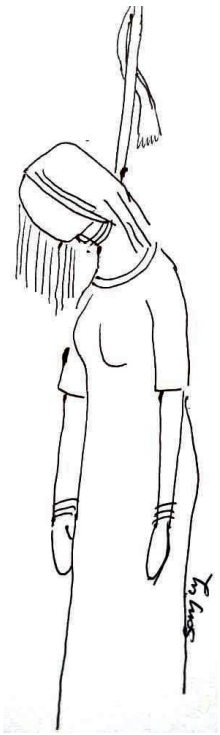

ছেলেটা ইতিহাস নিয়ে পড়ছে দ্বিতীয় বর্ষ। আমিও খুশি হয়েছিলাম ওদের ভালো দেখে। ওই ভালোবাসার পাঁচ বছর পুর্তিতে ওদের বিয়ে হয়ে যায়। ছেলেটা তখন শিক্ষক পদে সবে যোগ দিয়েছে। তবে এটা বলতেই হবে শামিমার সব স্বপ্নগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল ছেলেটা — ঘোড়ায় চড়ে বিয়ে করতে আসা, পালকিতে বিদায়, তাও সারা আকাশে আতরের গন্ধ মাখিয়ে দিয়ে। দুজনকে মানিয়েছিল বেশ, ভালোবাসাটাও কম ছিল না বোধ হয়।

কিন্তু বছর যেতে না যেতেই ঘটে গেল ঘটনাটা সোমবার সকালে ঝুলন্ত মৃতদেহ পাওয়া গেল শামিমার। ঠিক তার আগের দিন সন্ধ্যেবেলাতেই কথা হয়েছিল ওর সাথে। ও খুব খুশি ছিল। বলল, 'হুম, খুব ভালো আছি। তবে সংসারেই ব্যস্ত। আজ আবার একটা পার্টি আছে অনেকে এসেছে ওর বন্ধুরা, তাই তোকে পরে ফোন করবো।'

কে জানতো আর কোনদিনই ওর হাসি মুখের ছবিটা ভেসে উঠবে না মোবাইল স্ক্রিনে, আর কখনোই শুনতে পাব না নিজের ডাক নাম, যা ওর দেওয়া।

ডাক্তারের রিপোর্টে শুধু জানা গেছিল সাত থেকে আট জনের যৌন লালসার শিকার হয়েছিল শামীমা, স্বামীসহ। তারপর শ্বাসরুদ্ধ করে খুন!!!

ইচ্ছে পূরণ

মানবতা মাহাত

''ওই, এবারে পূজোয় অষ্টমীতে তুই আমার দেওয়া নীল শাড়ি পরবি, নীল রঙে না তোকে দারুণ মানাবে'' — চোখে মুখে দারুণ উত্তেজনা নিয়ে কথাটা বলেছিল মধুসূদন।

প্রত্যুত্তর দিয়েছিল পূর্ণিমা, ''পরতে পারি একটা শর্তে, তুমি লাল রঙের পাঞ্জাবি পরবে, যেটা আমি কিনে দেব তোমায়''

''ধুস, লাল রঙে বিচ্ছিরি লাগে আমায়, তুই বরং আমায় সাদাটা কিনে দিবি।''

একটু রাগ, অভিমান করেই পূর্ণিমা ফোনটা কেটে দিয়েছিল, কারণ তার অনেক দিনের ইচ্ছে সে অষ্টমীতে লাল রঙের পাঞ্জাবিতে তার মনের মানুষকে দুচোখ ভরে দেখবে।

এসব কথা পূজোর অনেকদিন আগের, মাঝখানে প্রায় একটা মাস কেটে গেছে, স্রোতের মতো জীবনও সাঁতরাতে সাঁতরাতে দু কূল ছাপিয়ে হারিয়েছে দূরে। ওরা আর একসাথে নেই, ছোট্ট একটা ভুলে কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল, ওরা হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারেনি এখনো। অথচ ওরা দুজনেই দায়ী।

আজ সেই বহুকাঙ্ক্ষিত অষ্টমী, সকাল থেকে মণ্ডপে ঢাক-ঢোলের স্বরে, ধূপ-ধুনোর গন্ধে, মায়ের আগমনীর খুশিতে ভরে রয়েছে। পূর্ণিমা আজ পরেছে হলদেটে পাড়ের শাড়ি, কানে ছোট্ট দুল, গলায় সরু চেন, চোখে কাজল আর কপালে ছোট কালো একটা টিপ। তাকে ঠিক বিয়েবাড়ির কন্যার মতো লাগছে। কিন্তু মধুর কোনো খবর নেই।

হঠাৎ যেন মণ্ডপের সামনের রাস্তায় বেলাগাম গাড়ির শব্দ হল, হৈ হৈ করে চিৎকার করে উঠল সবাই, তারপরই সব নিস্তব্ধ। ধরাধরি করে যখন মধুসূদনের নিথর দেহটাকে এনে মণ্ডপের বেঞ্চে শোয়ানো হলো, তখন তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পূর্ণিমা। মধুর সাদা পাঞ্জাবি তাজা হিমোগ্লোবিনে লাল হয়ে গেছে। সে তার ইচ্ছে পূরণ করেছে, সে লালই পরেছে। পূর্ণিমার চোখের কোণে একবুক সমুদ্র। মধুর হাতের মৃতপ্রায় ঘড়ি তখনো টিক টিক শব্দে জানান দিয়ে চলেছে — সময় বড় নিষ্ঠুর; সময় বড় কঠিন।

জিজ্ঞাসা

প্রদীপ মাহাত

অলো কুঁদরীর মা, আজ কি তরকারি রাঁধ্যেছিস্ ? চল্লিশোর্ধ এক মহিলা ডাকতে ডাকতে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করল। সীতামণি ওরফে কুঁদরীর মা স'বে উনান থেকে ভাতের হাঁড়িটা তুলে ফ্যানটুকু গড়িয়ে নিচ্ছে; সে কোনদিকে না তাকিয়েই জবাব দিল — ''সজনে শাকের ঝোল করব পিসীমণি, আলুর যা দাম আজকাল!

মোড়ল ঘরের একমাত্র অবিবাহিত মহিলা শঙ্করীদেবী। উপযুক্ত পাত্র এ তল্লাটে নেই বলে নিজেই কাছেই কন্যাকে রেখেছিলেন ভূপতিবাবু। সেদিনকার সেই মোড়লীয়ানা আজ আর নেই বললেই চলে মোড়লদের আর্থিক অবস্থা ও গোধূলির এক ছটাক কিরণের মতো উঁকি দিচ্ছে তথাপি শঙ্করী দেবী গ্রামের বাড়িগুলি ঘুরে ঘুরে আত্মগরিমা প্রকাশ করে না বেড়ালে স্বস্তি পান না।

— মুখে বিদ্রূপের অঙ্গ-ভঙ্গি করে বললেন তা কান্তকেও তো আজকাল বাড়িতেই দেখছি। কাজে আর যায়নি মনে হয় ? — কি করে যাবে গো পিসীমণি! লক ডাউনে কি কষ্টেই না বাড়ি ফিরেছে ভাবলেই গা শিউরে ওঠে, এক একবার ভাবি দরকার নেই বাবা বাইরে কাজ করতে যাওয়ার কিন্তু কি করি বলো, কুঁদরিও তো বছর পনেরোর হলো, মেয়েটাকে তো পার করতে হবে— সজনে শাক বাছতে থাকা সীতামণি এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

নিশিকান্ত আজ ছয়মাস হলো ঘরে বসা। আমেদাবাদের চটকলে কাজ করে যে কয়টা টাকা জমিয়েছিল লকডাউনে বাড়ি ফেরার গাড়ি ভাবা দিতেই অর্ধেক শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাকি যেটুকু সম্বল ছিল সেটুকু দিয়ে তার পৈত্রিক বিঘা দুই জমি ছিল তাতে আমন ধান চাষ করেছে বর্ষার মৌসুমে। কাজেই ভাঁড়ে মা ভবানী অবস্থা এই প্রান্তিক চাষী নিশিকান্ত মাহাতর। মা দুর্গার আগমণী বেজে উঠতেই কার্যত কান্নার রোল ওঠে নিশিকান্ত'র বুকের ভেতর। বড় মেয়ে কুঁদরী'কে তো বলেই দিয়েছে – ''এ বছর পারবো না মা, বায়না করিস্ না।''

সেও বাবার কষ্ট দেখে মাথা নেড়েছে। পড়াশুনা তো চুলোয় গেছে অনেকদিন আগেই, এবার পোষাকটাও! সাধারণ মানের পড়াশুনা হলেও খুব একটা খারাপ ছাত্রী নয় দশম শ্রেণীর কুঁদরী মাহাত। একশ মিটার দৌড়ে কোনোবারই সে দ্বিতীয় হয়নি। অনেক ট্রফি সে স্কুলকে উপহার দিয়েছে। সেই কুঁদরীই আজ ছয়মাস স্কুলে পা রাখতে পায়নি। ছাগলের জন্য আনা ধাধকি, ভুররু ইত্যাদি গাছের শাখা প্রশাখাগুলি উঠানের মাচাটিতে টাঙাতে টাঙাতে আনমনা হয়ে পড়েছিল সে।

'এ বিটি, তুঁই শাকটা ভাজিস মা, আমি বুধনীকে একটু ফ্যান্টা ধরে দিয়ে আসি।'' সম্বিত ফিরে পায় কুঁদরী, সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা অথচ সরল ও জটিল অঙ্কের হিসাবের চেয়ে জীবনের অঙ্ক অনেক জটিল বোধ হয়

তার। কিভাবে পরীক্ষা দেবে সে ? যদু মাষ্টার বলেছিল এন্ড্রয়েড মোবাইল কিনতে; অনলাইন ক্লাস হবে।

নিশিকান্তর অবস্থা দেখে আর কিছু বলেনি কুঁদরী। চোখের কোণটা শুধু চিক্ চিক্ করে উঠেছিল তার।

আজ মহাষ্টমী। মুখে মাস্ক লাগিয়ে সবাই পুজো দিতে যাচ্ছে, কুঁদরী শুকনো কাঠের চ্যালাটা উনুনের মুখে গুঁজে দিয়ে একছুটে পুকুর পাড়ে চলে গেল। ঘরে চাল বাড়ন্ত, যেটুকু রেশনে পেয়েছিল তা দিয়ে নিশিকান্ত ছোট মেয়ের পোষাক কিনে দিয়েছে, ভেবেছিল কিছুদিন তো বাকি আছেই ডাঙার ধানটুকু ততদিনে ঘরে তুলতে পারব। কিন্তু বিধি বাম!

আজ তিনদিন নিশিকান্ত বিছানা ত্যাগ করেনি। একটু একটু করে জ্বর আর কাশি। সবাই বলছে করোনা হয়েছে। গ্রামের একমাত্র ডাক্তার নিপেন পোদ্দার, তার কাছে ছুটে গিয়েছিল সীতামণি, কিন্তু তাকে বাড়িতে উঠতেই দেয়নি নিপেনবাবু। শূন্য হাতে বুকফাটা যন্ত্রণা নিয়ে ফিরে এসেছিল সীতামণি। গ্রামের লোক টিউবওয়েলে জল নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে তাদের। তাই পুকুর পাড়ে জল নিতে এসেছে কুঁদরী। বেলা গড়িয়ে বিকেল। কুঁদরী পাড়ে বসে কেঁদেই চলেছে একাকী। এ কান্না যেন অন্তহীন। এ কান্নার অর্থ নিপেন বাবুরা জানে না, আর জানে না প্রগতিশীল সমাজ আর শাসন ব্যবস্থা। কে জানে, হয়তো কুঁদরী নিজেও জানে না।

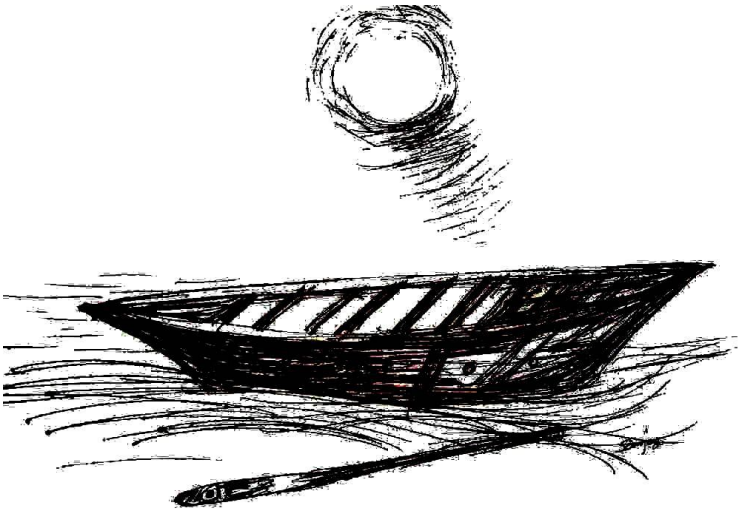

সারি সহরায়

জ্যোৎস্না সোরেন

হাতি লেকান সারি সহরায়...
সেটের আকান দাই না...
দেসে দাই না, দেসে দাই না...
আতাং দারাম মেম।
দেসে দাই না, লটা দাঃ,
দেসে দাই না, টেন্ডার মাচি...
হাতি লেকান সারি সহরায়...
দাই না লাং আতাং দারামে।
(হাতি এখানে বৃহৎ অর্থে, উপমা অলঙ্কার)
হাতি সম পরব দিদি...
মোদের ঘরে এসেছে...
এসো দিদি এসো দিদি...
বরন করি তাকে...।।
ঘটির জলে আতিথ্য করো
বসার জন্য চেয়ার দিওয়ো...
হাতি সম পরব দিদি
বরণ করি এসো।

মহামিলনের বীজ মন্ত্রে দীক্ষিত মানব সমাজ একে অপরের পরিপূরক। অন্যান্য ভাষাভাষীর মতোই আদি সমাজ জীবনেও খুশির প্রাবল্য ধরা পড়ে সারি সহরায় পরব উৎসবে।।

সারি অর্থাৎ সত্য, আর সহর + আয় (লাভ / উপার্জন) = সহরায়।

সহর এর আক্ষরিক কোনো অর্থ বাংলা শব্দ ভান্ডারে নেই। তবে আদিবাসী সাঁওতালি শব্দ সহর অর্থে আগমন বোঝায়। সহরেনায় বা সহর সেটেরেনায়। শহর ও সহর শব্দ দুটি বিশেষ্য পদ এবং ফার্সি গোত্রিয়। প্রাচীন সিন্ধু বা হরপ্পা মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় তিন ধরনের সামাজিক বিন্যাস চোখে পড়ে। সহর অর্থে শস্যপূর্ণ আধারকে বোঝানো হয়েছে। আর শহর অর্থে নগর কে বোঝানো হয়েছে।

আদিবাসী ঘরানার সহরায় (কার্তিক) মাস বর্তমান। কার্তিক মাস জুড়ে শস্যপূর্ণ ভাণ্ডার ভরে ওঠে। সেই জন্যই পুরো মাসের নাম সহরায়।

আদিবাসী মাইথোলোজিতে দেখা যায় গিরু নাই এর উপস্থিতি। লোহিত সাগর আর সিন্ধু নদ এর তীরে আদিবাসী অনার্যরাই প্রথম কৃষির পত্তন করেছিল।

সব মিলিয়ে এ কথায় প্রমাণ করে আদিবাসী মাইথোলজিতে শস্যপূর্ণ আধারকে সামনে রেখে তৎকালীন কৃষিজীবি মানুষ মাসের নাম সহরায় (কার্তিক) রেখেছিল। আর ফসল ভরে ওঠার কালকে সত্য অর্থাৎ সারি বলে মান্যতা দিয়েছিল, আবাহন করেছিল, বন্দনা করেছিল। আদিবাসী মানুষ সত্যের উপাসক, তাঁরা সবকিছুতে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাই হয়ত কৃষি বন্দনার মাসটিতে।

পৃথিবীর সব মাইথোলোজিতেই নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, অতিমানিতা ও অলৌকিকতার প্রকাশ ঘটানো হয়েছে। একমাত্র আদিবাসী মাইথোজি ও ধর্মই, সহমর্মিতা ও ভালোবাসার আচরণীয় জীবনাদর্শের ওপর আরোপিত, বলা ভাল প্রতিষ্ঠিত। মানবিকতাই এই ধর্মের মূল কথা। সব কিছুর মধ্যেই যে ভগবান বাস

করেন আদি ধর্ম তা মানে ও বিশ্বাস করে। সেই জন্যই গাছ পাথর লতা পাতা প্রাণী অপ্রাণী সকলকে জীব জ্ঞান করা হয়।

গরু জাগান্না বা জাগরণ সহরায় এর বিশেষ পর্ব। পাশাপাশি গ্রাম থেকে রাতের বেলা মাদল ও ধামসা সহযোগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গোশালায় গরুর মাহাত্ম কীর্তন করা হয়।

এই পরবের আরেক অঙ্গ ''খুণ্টাও''। অপেক্ষাকৃত রাগীদার গরুকে খুঁটিতে বেঁধে তার চারপাশে প্রলোভন সূচক উস্কানি দেওয়া হয়। সহরায় উপলক্ষে গ্রামীণ জনজীবনে আনন্দবিনোদনের এটা একটা পন্থা।

অন্যদিকে সহরায় পরব শুধুমাত্র বাস্তব জীবনকেই মেলে ধরেনা, ভার্চুয়াল জগৎকেও স্মরণ করে। অর্থাৎ পিতৃপিতামহ মহীদের আত্মাকে তৃপ্ত করার উদ্দেশ্যে নূতন মাটির হাড়িতে রান্না অন্ন পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে অর্পন করা হয়।

অতীত আর বর্তমানের মেলবন্ধনে সূচিত হয় ভবিষ্যৎ। হাতে কলমে জীবনকে চর্চা করার এই রীতি আদি ঘরানার লৌকিক আচরণে ধরা পড়ে।

আনন্দের উৎযাপনে মনে পড়ে প্রিয় মুখ, প্রিয় মানুষ, প্রিয় সান্নিধ্য। আনন্দ ভাগ করলে বাড়ে। সেই জন্য আত্মীয় সমাগমে সহরায় হয়ে ওঠে প্রাণের উৎসব। কৃষিজীবি মানুষ আদরিনী কন্যাকে কাছে পায় বছর শেষের এই পরবে। পিতৃসকাশে যাওয়ার ব্যাকুলতায় আদরিনী কন্যার হৃদয়ও উদ্বেলিত হয়।

পথ চেয়ে থাকে কৈশোরের খেলাঘরের আদরিনী উমা হয়ে। কখন আসবে প্রাণের আমন্ত্রণ বারতা। অগ্রজ প্রতিম ভাতৃ চরণে স্নেহশীলা অনুপমার হৃদয়ের আবেগ ধরা পড়ে... অনুরণিত হয় —

হাতি লেকান পরব দাদা / সেটেরাকান দাদারে..

দেশাচার ও লোকাচার ভেদে ''সারি সহরায়'' কোথাও কোথাও বাদনা পরব নামেও অভিহিত। রাজ কার্যের সুবিধার জন্য বল্লাল সেন সমগ্র বঙ্গদেশকে পাঁচভাগে ভাগ করেন।

১) বগড়ি — গঙ্গার দক্ষিণ ও ভাগীরথীর পূর্বাংশ জেলাগুলি।
২) রাঢ় — ভাগীরথির পশ্চিমাংশ ও গঙ্গার দক্ষিণ জেলাগুলি।
৩) বরেন্দ্র; ৪) বঙ্গ; ৫) মিথিলা

মল, রাঢ় (অপভ্রংসে ধাড়) ও বগড়ি দিশমে (দেশ) কালী পুজোর সময় সহরায় পরব পালন করা হয়। সহরায় মূলত গোত্রে সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ পরিবার কেন্দ্রিক। যেমন মাণ্ডি গোত্র, সরেন গোত্র ইত্যাদি। পদবী অনুযায়ীই গোত্র হয় আদিবাসী সমাজে। বাকী অংশে পৌষ সংক্রান্তি তিথিতে হয়। পৌষের ২৫ - ৩০ = ৫ দিন নিয়েই সহরায় বা বাদনা পরব। পাঁচ দিন ব্যাপী এই পরবের দিনগুলি বিভিন্ন নামে নামাঙ্কিত-

১। **উম** - নিজেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে স্নানাদি করে ও গবাদি পশুকেও স্নান করানো হয়।
২। **নাকড়া** - ঘরদোর কাপড় চোপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার দিন।
৩। **খুণ্টাও** - গরু খোটানো বা বাঁধা। রাঢ়, মল ও বগড়ি জেলাগুলিতে এই দিনে পিতৃপুরুষের জন্য উৎসর্গ করা হয় অন্ন ভোগ।
৪। **জালে** - বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাওয়া দাওয়ার চল দেখা যায়।
৫। **সাকরাত** - সাকরাতকে মারাং পরব বলা হয়। পিঠে পুলি, মাংসের কিমা, পিৎজা বা মাংসের পিঠে এই পরবের অন্যতম উপকরণ।

এই দিনে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে নতুন হাড়িতে রান্না করা অন্ন প্রসাদ পুজো করা হয় ও অর্পন করা হয় অর্থাৎ 'গিডি বাড়া' করা হয়। প্রতি ঘরে পিতৃপুরুষকে স্মরণ করা হয়। বিশেষ যে নাচ হয় এই পরবে তাকে বলা হয় 'সড়পা'।

এইভাবেই আদিবাসী মাইথোলজি মৌখিক কাহিনীর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েও তার নিজস্বতা ধরে রেখেছে যুগ যুগান্ত ধরে। কালের নিয়মে আজও যা ম্লান হয়নি।।

অরণ্যের রোদন

অর্দ্ধেন্দু বিকাশ রানা

বিকৃত কামনার ব্যক্তির নজর যত দিন না পড়েছে রূপসীর উপর ততদিনই রূপসী তার দেহ মনের সূচিতা রক্ষা করতে পেরেছে। পড়েছে তো আর রক্ষা নেই।

সবুজ বনানীর ঘোমটা টানা রূপসী ঝাড়গ্রাম যতদিন শখের শহুরে ধর্ষকদের চোখের আড়ালে ছিল, যতদিন সংগঠিত জঙ্গল মাফিয়াদের আড়ালে ছিল ততদিন সে ছিল অনাঘ্রাতা, টিকে ছিল তার সতীত্ব।

আজ রূপসীর বড়ই দীর্ণ দশা। সুন্দরী আজকাল সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তিগতভাবে নিত্য ধর্ষিত হচ্ছে।

সরকারীভাবে প্রতি বছর বৃক্ষরোপনের নামে চলেছে প্রহসন। আমার জিজ্ঞাসা জঙ্গলের জমিতে বৃক্ষরোপনের প্রয়োজন কেন এত। জঙ্গল জঙ্গলই, তাকে রোপন করে রক্ষা করা যায় না। রোপিত গাছ গাছালির সমারোহকে জঙ্গল বলে না। বড় জোর বাগান বলা যেতে পারে। আর এই বাগান শখের হলেও সুখের নয়। বাগান করতে কেউ মানা করছে না। যাও না নিজের বাপের জমিতে বাগান বানাও গে।

জঙ্গলকে রোপন করার কোন প্রয়োজন নেই। জঙ্গল নিজেই বিস্তৃত হয়। কিন্তু সেই সুযোগটা তো তাকে দিতে হবে। প্রতি বছর বৃক্ষরোপনের জন্য যে টাকা খরচ করা হয় সে টাকা দিয়ে যদি দশ বছর ধরে প্রহরার ব্যবস্থা করা হতো তবে জঙ্গল নিজেই লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ রোপন করে বনভূমিতে পরিণত হত। ঘন শ্যামলিমায় উছলে পড়তো চারিদিক।

জানি না কোন বিশেষজ্ঞের পরামর্শে এখানকার আদি কাল থেকে প্রকৃতি নির্বাচিত শাল মহুলের জঙ্গলকে বিনষ্ট করে রোপন করা হচ্ছে সুদূর অষ্ট্রেলিয়া থেকে নিয়ে আসা ইউক্যালিপ্টাস যা ঝাড়গ্রামের বনভূমিকে দূষিত করে তুলেছে। সরকার গাছটির অর্থকরী দিকটার দিকেই বেশী নজর দিয়েছে এর জন্য এখানকার প্রকৃতির বাস্তুতন্ত্রই নষ্ট হতে চলেছে সেদিকে নজর দেবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। এ এমনই গাছ যার নীচে ঘাসও হয় না লতাগুল্ম পাতা মেলে না এমন কি পারত পক্ষে পাখিরাও এর ডালে বাসা বাঁধে না, বসেও না। সরকার এই বিদেশী গাছ রোপন বন্ধ করে যেন প্রকৃতিকে ধর্ষণ করা থেকে বিরত থাকেন।

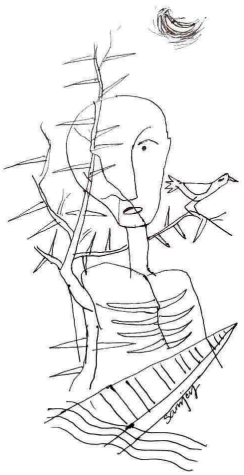

এরপর আছে জঙ্গল মাফিয়ার দল। যারা রাতের অন্ধকারে কসাইয়ের মতো বৃক্ষ নিধনে মত্ত। চুরি হয়ে যাচ্ছে সবুজ বন। এদের সাথে যোগসাজস আছে কিছু কোরাপটেড নেতা ও সরকারি আধিকারিকের। এদের ধর্ষণ ভয়াবহ ও বড়ই নিষ্ঠুর। রূপসী নির্বাক হয়ে লাঞ্ছিত হতে থাকে।

সবশেষে আছে বেশ কিছু শহুরে ও হুজুগে শখের প্রকৃতি প্রেমী। এরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে ভ্রমণের নামে প্রকৃতিকে ধর্ষণ করতে। ফেলে যায় তার নিশানা। প্লাস্টিক, মদের বোতল, থার্মোকলের বর্জ্য। এর জন্য মাটি দূষিত হচ্ছে নদীর জল দূষিত হচ্ছে ছড়িয়ে পড়ছে বিষ। নীলকণ্ঠের বিষ গ্রহণের সীমাবদ্ধতা আছে। এদের মানসিকতার কবে যে পরিবর্তন হবে কে জানে!! এরা হয়তো ভাবে আমরা তো এখানে বাস করি না আমাদের কি ক্ষতি হবে। ঘা বাড়তে বাড়তে যে গ্যাংগ্রিন হবে, সেদিন কি টনক নড়বে ? তখন কিন্তু কিছুই করার থাকবে না। কথায় বলে শিরে সর্পাঘাত হলে তাগা বাঁধবে কোথায় ?

এই সব বিকৃত মানসিকতার লোকদের নজর থেকে রূপসী কতদিন নিজেকে রক্ষা করতে পারবে কে জানে! আমরা ভাবতে চাইনি, গাছও যে একটা প্রাণী তারও তো প্রাণ আছে। তারও আছে দুঃখ যন্ত্রণা, বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর লড়াই। কিছু নির্বোধ কেমন অবলীলায় একটা জীবন্ত গাছে পেরেক ফুটিয়ে বিজ্ঞাপন লাগিয়ে চলে যায়। বোবা প্রাণ ফুঁপিয়ে কাঁদে, আমরা কেউ শুনতে চাই না সে কান্নাতে তার যন্ত্রনা নীরব ভাষা।

আজ আমাদেরই এর প্রতিকারের জন্য এগিয়ে আসতে হবে, যারা আমরা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। সজাগ থেকে এই সব ধর্ষকদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে আমাদের শান্তির ছায়াকে, নির্মল প্রাণ বায়ুকে, নদীর স্বচ্ছ জলকে, সর্বোপরি আমাদের বসবাসের ঘরটুকুকে।

অরণ্যের রোদন বন্ধ করতে আমরা কি অরণ্যে রোদন করেই যাবো!

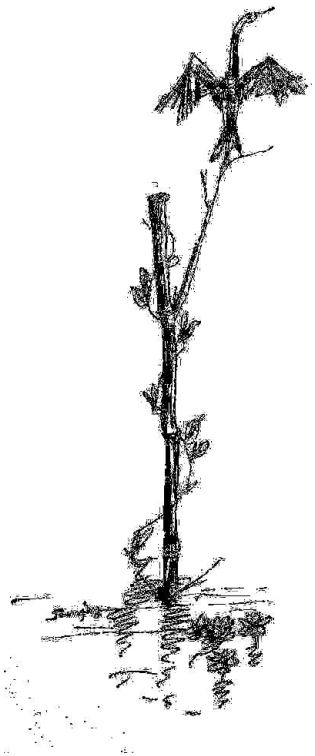

লাদেন

বিমল লামা

গরু খোঁজা কাকে বলে সে ধনার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না। যদিও তার বয়স অল্পই, পনের কি ষোল, তবু সে জানে কারণ সে বাগালি করে। অর্থাৎ পেশায় সে রাখাল ছেলে। স্বাবলম্বী। দপ্ত তার এই বিস্তীর্ণ জঙ্গল মহলের একটা অদৃশ্য গণ্ডি ঘেরা ভূ-ভাগ।

এখন এই গণ্ডিটা মনে মনে সে জানে। আর সে বিশ্বাস করে তার গরু আর ছাগলেরাও জানে। বাস্তবে দেখাও যায় গণ্ডি পেরিয়ে ঘাসের খোঁজে বেরিয়ে যাচ্ছে না কোনও গরু ছাগল। কিন্তু সব সমাজেই অন্যরকম নমুনা থাকে যাদের ছাঁচ নক্সা সাধারণের সঙ্গে মেলে না। তেমন নমুনা গরুদের সমাজেও পাওয়া যায়। আর সেটা হলেই বারবার ধনাকে পরীক্ষা দিতে হয় কতটা দক্ষ সে হয়েছে গরু খোঁজার কাজে।

রোজ সে বাইশটা গরু আর দশটা ছাগল নিয়ে বনে আসে চরাতে। সকালে সঙ্গে তার মা আসে। জঙ্গল ছেড়ে দিয়ে যায়। সারাদিন ধনা ওদের উপর নজর রাখে। দিনের শেষে আবার মা আসে। দু'জনে মিলে সবাইকে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে যায় গ্রামে।

গ্রামের মুখে একবার রওনা করে দিতে পারলে আর চিন্তা নেই। প্রত্যেকেই নিজের ঘর চেনে। যে যার মতো একে একে বাড়ি ঢুকে যায়। সমস্যা হয় ফেরার সময় কাউকে খুঁজে পাওয়া না গেলে। ধনা আর ধনার মা ছাড়া বাকিরা কেউ পরোয়াও করে না সেটা। একটা জলজ্যান্ত গরু যে নিরুদ্দেশ সে নিয়ে অন্য কোনো গরুর মাথাব্যথা নেই। এমন কি সেই নিরুদ্দেশ গরুর নিজের গোঠের অন্য সদস্যদেরও না। বাবার তো কারোর ঠিক নেই। মা হলে তারও কোনও ভাবান্তর নেই। আর সবার সঙ্গে গরুর মা-ও হাঁটা দেয় বাবুলগাম চিবুতে চিবুতে। তেমনই মনে হয় ধনার। না হলে এত কি চিবোয় সারাক্ষণ। ঘরে ফিরেও চিবোনো বন্ধ হয় না।

এমন হলে ধনা মাকে গ্রামে ফেরত পাঠিয়ে দেয় দলের সঙ্গে। নিজে শুরু করে দিন শেষের গরু খোঁজা। তো বেশিরভাগ দিনই তেমন বেগ পেতে হয় না। তার কাল্পনিক গণ্ডির ভেতরেই খুঁজে পাওয়া যায় তাকে। খোঁজার সময় চোখ তেমন সাহায্য করতে পারে না। বনের গাছ গাছালির আড়ালে দৃষ্টি চলে না। নির্ভর করতে হয় কানের উপর। কান খাড়া করে শুনতে হয় অর্থবহ শব্দ উঠছে কোথায়।

সন্দেহভাজনদের গলায় ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হয়। মানে যারা সীমানা লঙ্ঘনের ঝোঁক দেখার স্বভাবে। ঘণ্টা মানে, আগে তো তৈরি হতো কাঠ দিয়ে। এখন স্টিলের গ্লাস ফুটো করে গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সস্তাও হয়, আওয়াজও ভালো। বেশ জোরালো।

তেমন ঘণ্টা বাঁধাও ছিল লাদেনের গলায়। ধনা নাম দিয়েছে তার বলশালী– বিরাট চেহারার জন্য। অবশ্য তার আগে একটা হাতি ছিল ওই নামে। পাগলা হাতি। তার ওপর এক চোখ কানা। বেশ কিছুদিন উৎপাত লাগিয়েছিল এলাকায়। তারপর মারা যায় ধান ক্ষেতের মাঝখানে। বলা যায় লোকে একরকম মার্ডারই করে ছিল হাতিটাকে। ধনাও পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল তাকে। কিন্তু অত বড় শরীরটা যখন গড়িয়ে পড়ল, ধনার খারাপই লেগেছিল দেখে। তার স্মৃতি সে ধরে রেখেছে নিজের প্রিয় গরুর মধ্যে। তার নামে তার নাম দিয়ে। ধনা খুব ভালোবাসে লাদেনকে। বলা যায় ওরা ভালো বন্ধু। এতই বন্ধু যে লাদেন ধনাকে পিঠে নিয়ে হেঁটে বেড়ায়। ধনা ওকে আদর যত্ন দেয়। কখনো মারে না। উল্টে গা ধুয়ে দেয় জল পেলে। গলায় পলাশ ফুলের মালা গেঁথে পরিয়ে দেয় বসন্তকালে। নিজের গায়ে মাখা মহার্ঘ তেল মাখিয়ে দেয় তার বিরাট দুটো শিং-এ। উঁচু গাছের খাদ্য পাতা পেড়ে দেয় ওর জন্য। প্রতিদানে লাদেন তার পিঠে চড়তে দেয় ধনাকে। ধনা এমন করে বসে তার পিঠে যেন লাদেন তার চলমান সিংহাসন। আর সে রাজা জঙ্গলের।

সেই লাদেন আজ নিরুদ্দেশ। দল নিয়ে মা ফিরে গেছে গ্রামে। লাঠি হাতে ধনা তার জঙ্গল মহলের

কাল্পনিক গণ্ডির ভেতর অনুসন্ধান চালাচ্ছে। সন্ধ্যার মুখে বনের রূপরেখা বদলে যাচ্ছে দ্রুত। কমে আসছে আলো। বদলে যাচ্ছে শব্দেরা। একে একে চুপ করে যাচ্ছে এক এক জাতের পাখির ঝাঁক। বদলে সাড়া জাগাচ্ছে পতঙ্গেরা। ছোট বড় বুনো জীবেরা। কাছেই কোথাও ময়ূর ডাকছে কেমন অশুভ স্বরে। কিন্তু ধনার এটাই কর্মক্ষেত্র। তার জীবনের সূর্যালোকিত সময়কালের বেশিরভাগটাই সে কাটিয়েছে এই জঙ্গলে। তাই তার কিছুই মনে হয় না। কোথাও কোনো অশুভ শব্দ গন্ধ সে মোটেই পায় না।

তবুও ধনা উদ্বিগ্ন। কারণ লাদেনের স্টিলের গ্লাসের ঘণ্টার কোনও শব্দ উঠছে না কোথাও। তার খুরের তলায় গুঁড়িয়ে যাওয়া শুকনো ডাল পাতার শব্দও না। যেন লাদেনের অস্তিত্বই নেই নেই ত্রিসীমানায়। অথবা গ্রামের জগা মাতালের মতো বেমক্কা সে ঘুমিয়ে পড়েছে কোনও অজায়গায়।

ধনা বোঝে শব্দে সে খুঁজে পাবে না লাদেনকে। অগত্যা সে ডাকতে থাকে তার সাংকেতিক ধনিতে যা সে রপ্ত করেছে বহু দিনের অভ্যাসে। এক বিশেষ ডাক যা জঙ্গলের নির্জনতায় প্রায়ই ভেসে আসে ঝোপ ঝাড়ের আড়াল থেকে। সেই ডাক সব গরুই চেনে। যোগসূত্র অটুট থাকে বাগালের সাথে। নিহিত নির্দেশ পালনও করে নিঃশব্দে।

কিন্তু আজ কোনও সাড়া নেই। একাই ডেকে ডেকে গলা শুকিয়ে ফেলে ধনা। একে একে থেমে যায় সব পাখি। সব ময়ূর। ঝিঁঝিরা দায়িত্ব নেয় অরণ্য আবহের। ইতি উতি ডাক ওঠে পেঁচার। বাদুড়ের। দূরে কোথাও কলহ করে শেয়ালের পরিবার। আলো কমে আবছা হয়ে আসে বন। তবু ধনা হাল ছাড়ে না। তার কাল্পনিক গণ্ডির পুরোটাই সে চষে ফেলে। কোথাও আভাসটুকুও নেই লাদেনের। রাত নেমে আসে জঙ্গলে। ধনার এবার ভয় ভয় করে একা একা। সে বাগাল। দল বল নিয়েই থাকে সব সময়। বিশ তিরিশটা প্রাণীর বিরাট দল। আজ রাতের অন্ধকারে সে একা জঙ্গলে। নিজেও দলছুট হয়ে আরেক দলছুটের সন্ধানে।

তার গণ্ডি ঘেরা কাল্পনিক সাম্রাজ্যের কোথাও কোনো চিহ্ন নেই লাদেনের। শুধু তার স্টিলের ঘণ্টা গ্লাস খুঁজে পায় ধনা। দড়ি ছিঁড়ে পড়েছিল মাটিতে। অবশেষে ধনা এসে পড়ে তার মহালের পশ্চিম সীমানায়। সুবর্ণরেখা নদীর বিস্তীর্ণ নাবালে। জল তার হাঁটুর নিচে। দু'পাড়ে বালি আর পাথরের বিস্তার। ওপারে ঝাড়খণ্ডের বনাঞ্চল। সেদিকে তাকিয়ে ধনা ভাবে, লাদেন কি তবে দেশান্তরী হলো!

ভাবতে ভাবতে এমন পাল্টে যায় দৃশ্যপট যে ধনার কিশোর মনেও শিহরণ জাগে। হঠাৎ কোত্থেকে উঠে আসে বিরাট এক চাঁদ। ডানদিকের উঁচু টিলাটার ঠিক মাথার ওপর। আর সেই চাঁদের আলোই এক্কেবারে বদলে দেয় নদী বন আর পাহাড়ের রঙ-রূপ। গা ছমছমে অন্ধকার পরিবেশটা হঠাৎ কেমন স্বপ্নলোকের মত দেখায়। সুবর্ণরেখার জলে গুলে যায় চাঁদের আলো, তৈরি করে এক অবাস্তব রূপোলি প্রবাহ। তার দু'পাড় জুড়ে উজ্জ্বল আভাময় বালির বিস্তার। তারই ওপর ছড়ানো ছোট বড় স্ফটিক খণ্ডের মতো বোল্ডার। বিস্তৃত চাটান। কোথাও প্রাকৃতিক পাথুরে স্তম্ভ।

ধনা অবাক হয়ে দেখে প্রকৃতির নৈশ রূপ। তার চিরচেনা বনমহলটা যে রাতে এমন মায়াবী রূপ ধরে সটা তার জানা ছিল না। মনে মনে সে আরও গর্বিত হয়ে পড়ে তার 'জমিদারি'র এমন লাবণ্য দেখে।

মুগ্ধতার ঘোর কেটে হঠাৎ সে চমকে ওঠে। জলধারা লগ্ন বালুতটে বেমক্কা নড়ে ওঠে একটা বোল্ডার। সেদিকে তাকিয়ে ধনা প্রথমে চমকে উঠলও পরক্ষণেই আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার মুখ। যাকে

সে পাথর ভেবেছিল সেটাই আসলে লাদেন। নদীর পাড়ে বালির ওপর বসে আছে নিশ্চল হয়ে। যেন বেটা বেড়াতে এসেছে। পান চিবোতে চিবোতে উপভোগ করছে প্রকৃতির রূপ। ধনা এক ছুটে হাজির হয় লাদেনের কাছে। জড়িয়ে ধরে তার গলা। হাত বুলিয়ে দেয় তার মাথায়-কপালে-শিঙে-নাকে-মুখে-গলকম্বলে। লাদেনও মাথা নাড়ে প্রত্যুত্তরে। যেন সে-ও খুশি হারানো প্রিয়জনকে ফিরে পেয়ে।

ধনা লাদেনকে ঠেলেঠুলে তোলার চেষ্টা করতেই যাচ্ছিল হঠাৎ আর্ত চিৎকার কানে আসে। মুখ তুলে তাকায় সে। ওপারের বন থেকে ভেসে আসছে মানুষের আর্ত স্বর। যেমন কেউ চিৎকার করছে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে। ঠাহর করে তাকায় ধনা। কিন্তু চোখে কিছুই পড়ে না। শুধু টানা আর্তনাদ শুনতে পায়। তীক্ষ্ণ মেয়েলি কণ্ঠে কেউ আর্ত চিৎকার করছে, যেন আতঙ্কে। ক্ষীন কিন্তু সন্দেহাতীত!

লাদেনকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় ধনা। হাতের লাঠিটা বাগিয়ে নিয়ে এগোতে শুরু করে নদীর দিকে। সহজেই পেরিয়ে যায় সুবর্ণরেখার হাঁটুজল। ওপারের বালিতে পা দিতেই আরও স্পষ্ট আরও তীব্র হয় সেই আর্তনাদ। সমানেই বনের প্রান্তে এক ঝোপের আড়াল থেকে ভেসে আসছে সেই কাতর কান্না। সাবধানে পা টিপে টিপে সেদিকে এগোয় ধনা। একদম কাছে পৌঁছে উঁকি মারে ঝোপের ভেতর আর দেখে দুটো লোক একটা মেয়েকে মাটির ওপর ফেলে ঠেসে ধরেছে। তারা তার জামা কাপড় খোলার চেষ্টা করছে, আর মেয়েটা পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়ছে আর চিৎকার করছে।

ধনা প্রথমটায় নিজেই ভয় পেয়ে গেলও পরক্ষণেই সে মনস্থির করে ফেলে। তার গরু পেটানো লাঠিটা বাগিয়ে তাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়ায় আর সর্বশক্তি দিয়ে একটা প্রবল ঘা মারে একজনের মাথায়। এত জোরে সে মারে যে লোকটা এক আঘাতেই উল্টে পড়ে একপাশে। আর নড়েও না। দ্বিতীয়জন ব্যাপার বুঝে সামলে ওঠার আগেই ধনা তাকেও মারে। যদিও সে হাত দিয়ে মার আটকাতে যায়। আঘাত গিয়ে হাতেই পড়ে। হয়তো তার হাতটা ভেঙে যায়। সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে দৌড় দেয় বনের গভীরের দিকে। মেয়েটা তখন আতঙ্কে থর থর করে কাঁপছে। চাঁদের আলো এসে পড়ছে তার নিষ্পাপ শিশু মুখে। বিস্রস্ত এলোমেলো চুল। আধখোলা তার জামা-কাপড়, কামিজ-সালোয়ার। দুচোখের আতঙ্ক উপচে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা। কাছেই মাটিতে পড়ে থাকা ওড়নাটা তুলে নেয় ধনা। সেটা জড়িয়ে দেয় মেয়েটার গায়ে। বলার মতো কোনো কথাই সে খুঁজে পায় না। ধনা মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। ভীষণ লজ্জা পায়। তার কোনো মেয়ে বন্ধুও নেই। কি করবে বুঝতে না পেরে ধনা শেষে মেয়েটার সামনে থেবড়ে বসে মাটিতে। বিষণ্ণ মুখে চেয়ে থাকে তার দিকে। মেয়েটাও পাল্টা চেয়ে থাকে ধনার দিকে। তখনো সে কাঁদছে হেঁচকি তুলে তুলে। যেমন কাঁদে বাচ্চারা। যদিও তার কান্নার তীব্রতা আর নেই। তার চোখ মুখের আতঙ্কও কমে এসেছে। কান্না ধরে আসছে ক্রমশ। অনেকটা স্বাভাবিক লাগছে তাকে। মনে হয় মেয়েটা তারই বয়সী হবে, কি আরও ছোট। কিন্তু সে কোনও কথাই বলে না। বোকার মত মুখ করে চেয়ে থাকে মেয়েটার দিকে, যেন তারই আদেশের অপেক্ষায় বসে আছে।

একসময় মেয়েটা চুপ করে যায়। সামলে উঠে নিজের জামা কাপড় ঠিক করে। সহজ হয়ে বসে। চুল ঠিক করে। তারপর পড়ে থাকা লোকটার দিকে তাকিয়ে বলে, ''মর গয়া ?''

ধনা উঠে লোকটাকে পরীক্ষা করে। মদের বিকট গন্ধ। কিন্তু শ্বাস নিচ্ছে ঠিকঠাক। যেন ঘুমাচ্ছে শান্তিতে। ধনা বলে, ''শো রাহা হ্যায়।''

মেয়েটা বলে ''মেরা বাপ।''

ধনা অবাক হয়ে তাকায় তার দিকে। কোনও রকমে বলে, ''বাপ!''

''সতেলা'', বলে মেয়েটা।

ধনা আর কিছু বলে না। মেয়েটা নিজের থেকে শোনায় তার গল্প। মা পুব খাটতে গেছে বর্তমানে। সে একাই ছিল তার সৎ বাপের সঙ্গে। মদ খেয়ে এক বন্ধুকে নিয়ে ঘরে আসে। দু'জনে মিলে তাকে আক্রমণ করে। বনের ওই প্রান্তেই তাদের ঘর। সে কোনও রকমে পালিয়ে যায়। পিছু ধাওয়া করে

ধরে ফেলে এখানেই। তার আশঙ্কা ওই লোকটা আবার ফিরে আসবে আরো লোক নিয়ে। তাই সে পালাতে চায়। ধনা তবু বসেই থাকে নির্বিকার মুখে। বোকার মতো চেয়ে থাকে মেয়েটার দিকে। মেয়েটা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে ধনার মতামতের জন্য। কিন্তু ধনা মুখ খোলে না। শেষে মেয়েটাই উঠে দাঁড়ায় আর রাগত স্বরে বলে, ''ক্যা করুঁ ?''

ধনা এবা নড়ে। উঠেও দাঁড়ায়। তারপর নদীরে দিকে ফিরে বলে, ''চল মেরে সাথ।'' বলেই সে হাঁটা দেয় জলের দিকে। মেয়েটা তাকে অনুসরণ করে। ধনা হঠাৎ পিছন ফিরে জিজ্ঞেস করে, ''আঁজির খায়েগি ?''

মেয়েটা মাথা নেড়ে জানায় খাবে। ধনা পকেট থেকে দুটো পেয়ারা বার করে একটা মেয়েটার হাতে দেয়। অন্যটায় কামড় বসায় নিজে। তারপর পেয়ারা চিবোতে চিবোতে দুজনে পা রাখে সুবর্ণরেখার জলে। জলে নেমে মেয়াটা নিচু হয়ে জল খায়। চোখে মুখে জল দেয়। হাত পা ধোয়। পাড়ে উঠে ধনা লাদেনকে লাঠি দিয়ে খোঁচা দেয়। মুখে বলে, ''ওঠ! কে এসেছে দেখ!''

লাদেন ওঠে। যেন সত্যি বুঝেছে কথাটা এমন ভাব করে মেয়েটার দিকে তাকায়। আলাপ করিয়ে দেওয়ার মতো করে ধনা বলে, ''দেখ, এর নাম হলো .....।''

মেয়েটা বলে, ''পার্বতী।''

ধনা বলে, ''ইয়ে লাদেন। হাম ধনপতি।''

ওদিকে ধনা আর লাদেন না ফেরায় গ্রামের লোকে বেরিয়েছে তাদের খোঁজে। লাঠিসোটা টর্চ মশাল নিয়ে। তার বনের ধারে জড়ো হয়ে পরামর্শ করছিল কোনদিক দিয়ে খোঁজ শুরু করবে। হঠাৎ কানে আসে টুং টুং শব্দ। কিন্তু চাঁদের আলো সত্ত্বেও কিছু দেখা যায় না। যদিও টুং টুং শব্দ কানে আসে অবিরাম। ক্রমশ যেন কাছে সরে আসছে। তারা অপেক্ষা করে চেয়ে থাকে বনের দিকে ঘণ্টার শব্দের অভিমুখে।

তারপর গাছ পাতার আড়ালে খসখস শব্দ ওঠে। মড়মড় করে ভাঙে শুকনো ডালপালা। আর চন্দ্রালোকিত বনভূমির পটে ভেসে ওঠে এক বিরাট ষাঁড় গরু। গ্রামের গর্ব লাদেন। আনন্দে তারা চিৎকার করতেই যাচ্ছিল। কিন্তু বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে লাদেনের পিঠের সওয়ারি দেখে। ধনা নয়। তার পিঠে বসে আছে এক কিশোরী কন্যা। তার লম্বা ঝোলানো কেশরাশির ভেতর চাঁদের আলো জড়িয়ে গেছে। তার শান্ত মুখে চন্দ্রাহত অপরূপ বিহ্বলতা। যেন অপার বিস্ময়ে সে চেয়ে আছে জগৎ সংসারের দিকে। অনন্ত কৌতূহলে বুঝি বা সে নেমে এসেছে এই চাঁদ-বন পরিদর্শনে। যেন সে কোনও দেবী। বনদেবী। নিশুতি রাতে অসাবধানে হঠাৎ পড়ে গেছে মানুষের সামনে।

লাদেন তাকে পিঠে নিয়ে হেলেদুলে বেরিয়ে আসে বন থেকে। বিস্ময় বিমূঢ় মানুষজন খেয়ালও করে না, ধনাও আসছে পিছন পিছন, খুশি খুশি মুখ করে!